মাটি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মাটি

উত্তর কলকাতার অধিবাসীদের অন্তত সিকি লোক লোকটিকে বোধ হয় চেনে, অর্ধেক লোক ওর কণ্ঠস্বর শুনেছে এবং শুনলেই চিনতে পারে—এ সেই কণ্ঠস্বর! ষোল আনা লোকই ওর কণ্ঠস্বর চেনে বলতে দ্বিধা করতাম না, কিন্তু মধ্য-দ্বিপ্রহর ছাড়া অন্য কোন সময়ে লোকটির হাঁক শোনা যায় না। মধ্য-দ্বিপ্রহরের একটা অবসাদ আছে, মহানগরীও কিছুক্ষণের জন্য পাখির রাজ্যের মত ঝিমিয়ে পড়ে। রাজপথে লোক বিরল হয়, ট্রামে বাসে সিট খালি পড়ে, গতিও যেন মন্থর হয়, ড্রাইভারের হাতের মুঠি বোধ হয় আলগা হয়ে আসে: দোকানে খরিদ্দার কমে যায়, কর্মচারীরা কেউ পেন্সিল ঠোঁটে চেপে জনবিরল পথের দিকে চেয়ে থাকে, বসে ব'সেই অনেকে ঘুমোয়, আপিস-অঞ্চলেও এ সময়টায় কাজকর্ম ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, টেলিফোনের রিসিভার তুলে সাড়া পেতে দেরি হয়, ফুটপাতে জুতো-পালিশওয়ালারাও ঢোলে ঝিমোয়: বাড়িতে দরজা বন্ধ থাকে, মেয়েরা হয় ঘুমোয় নয় আস্তে ধীরে কিছু বোনে বা সেলাইয়ের কল চালায়, রেডিয়োতে গান বক্তৃতা বেজেই চলে; এ সময় আকাশের দিকে তাকালে ক্বচিৎ দু'একটা চিল বা শকুন উড়তে দেখা যায় নইলে আকাশটাও খাঁ-খাঁ করে; আমার পাশের বাড়িতে আছে একটা এ্যালশেশিয়ান, সেটাও এ সময়ে চোখ বন্ধ ক'রে জিভ বের করে হাঁফায়, তার মাথার উপরে বারান্দার কড়িতে পায়রাগুলো পা ভেঁজে বুকে ভর

দিয়ে শুয়ে থাকে, কিন্তু কুকুরটা ধরবার জন্য লাফায় না। পথে খাবার পড়ে থাকে, কাক দেখা যায় না।

এরই মধ্যে অকস্মাৎ উত্তর কলকাতার কোন-না-কোন পথে বা গলিতে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে—মাটি চা—ই, মা—টি।

কণ্ঠস্বরই শুধু তীক্ষ্ণ নয়, লোকটির হাঁকের ভঙ্গিও বিচিত্র, শেষের মাটি শব্দটার 'মা' পর্যন্ত চিৎকার করে হেঁকে 'টি'র শেষে হ্রস্বইটাকে বেপর্দায় খাদে নামিয়ে দেয় তার প্রতিক্রিয়া হয় অদ্ভুত, সমস্ত শরীরের স্নায়ুমণ্ডলী কেমন যেন চমকে শিউরে ওঠে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে এই বিচিত্র ভঙ্গিমায় উচ্চারণে স্নায়ুর উপর ধ্বনির প্রভাব সর্বজনীন কি না জানি না, তবে আমি এ প্রভাব অনুভব করেছি এবং আমার বাড়ির একটি শিশুকে চমকে উঠে ঠোঁট ফুলাতে দেখেছি। গ্রীষ্ম-দ্বিপ্রহরে আমার ঘুমের আমেজ ভেঙে গিয়েছে, বন্ধ-দুয়ার জানালা, অন্ধকার ঘরের মধ্যে হঠাৎ ঘুম ভেঙে কতদিন মনে হয়েছে—আমি শুয়ে আছি আমার দেশের বাড়িতে, বাড়ির পিছনেই তালগাছঘেরা খিড়কীর পুকুরের কোন তালগাছের মাথায় বসে রৌদ্রশ্রান্ত চিল তীক্ষ্ণ করুণ সুরে ডাকছে চি-লো-চি-ল-অ। শেষে আকারটা ঠিক এমনি বেপর্দায় নরম সুরে নেমে এসে থেমে যায়। চিলটার ঠোঁটের নিচে গলার কাছটা ধুক ধুক করে কাঁপে।

উত্তর কলকাতায় বাসা করার প্রথম সপ্তাহেই ওর ডাক শুনেছিলাম। তখন বৈশাখ মাস। মনে আছে বাসা পেতেছিলাম ৬ই বৈশাখ। গলির মোড়ে সেদিন ওর হাঁক উঠতেই দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। খাঁ-খাঁ করছে গলিপথ, পিচের উপর মোটর-টায়ারের ও নালমারা জুতোর দাগ ফুটে উঠছে, বাতাস ঝলসাচ্ছে, বাড়ির গায়ে এক টুকরো কোনাচে জায়গায় একটা কনকচাঁপা গাছের লম্বা পাতাগুলি

অবসন্ন হয়ে ঝুলে পড়েছে। আকশের দিকে চোখ তোলা যায় না, হাপর থেকে বের করার কয়েক মুহূর্ত পরে নীল হয়ে হাওয়া ধাতুপাত্রের মত উত্তাপ বিকীর্ণ করেছে। সে উত্তাপ চোখে এসে লাগছে। এরই মতো ওর এই হাঁক উঠছে—মাটি চাই মাটি-ই।

তাকিয়ে রইলাম পথের দিকে। আবার হাঁক উঠল—মাটি চাই—মাটি-ই। হাঁকটা এবার দূরে চলে গেল।

মাটি চা—ই মা—টি—ই। এবার আরও দূরে। বাঁকের ওপারে আমাদের গলি থেকে একটা অত্যন্ত অপ্রশস্ত গলি এঁকে বেঁকে চলে গেছে দক্ষিণমুখে, সম্ভবত লোকটা সেই গলিপথে ঢুকে চলে গেছে। কিন্তু লোকটার কণ্ঠস্বর, তার ওই হাঁকের বেসুরা সমাপ্তি সমস্ত মনটাকেই শুধু অস্বস্তিতে ভরে দিয়ে গেল না, শরীরেও একটা চকিত চাঞ্চল্য বইয়ে দিয়ে গেল।

কিছুদিন পর ওকে দেখলাম। সেদিন দুপুরেই বেরিয়েছিলাম কাজে। ফড়েপুকুর স্ট্রীটে ঢুকে খানিকটা অগ্রসর হতেই ওই তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরের বেসুরা হাঁক কাছেই কোথায় ধ্বনিত হয়ে উঠল। এক মুহূর্তে যে কৌতুহল স্তিমিত হয়ে পড়েছিল সে দীপ্ত হয়ে উটল, ওই হাঁকটা যেন ফুৎকার দিয়ে জাগিয়ে তুলল—দপ্ ক'রে জ্বালিয়ে দিল। দিক অনুমান করে এগিয়ে গেলাল।

—মাটি চা—ই মা—টি—ই।

থমকে দাঁড়ালাম। হাঁকটা পিছনে পড়ে গেছে। পিছন ফিরলাম—দেখলাম পিছনে একটা পাশের গলি থেকে মাটিওলা বোরিয়ে

আসছে। বিচিত্রদর্শন উলঙ্গপ্রায় মানুষ। পরনে শুধু একটা নেংটি সর্বাঙ্গ কাদায় আবৃত। সন্ন্যাসীরা যেমন ভস্মে সর্বাঙ্গ আবৃত করে তেমনিভাবে কাদায় মাখা লোকটির সর্বাঙ্গ। সময়টা তখন বোধ হয় আষাঢ় মাস। রৌদ্রের প্রখরতা বৈশাখের চেয়ে কম নয়, উপরন্তু বাতাসে সঞ্চারিত হয়েছে সজলস্পর্শ, মাটিও হয়েছে সরসসিক্ত, তার ফলে একটা গুমোট তাপানিতে ভরে উঠেছে বাংলাদেশ, জ্বালার বদলে ঘেমে মানুষ সারা হয়ে গেল। লোকটির গায়ের ধুলো কাদা হয়ে উঠেছে, সেই কাদা ঘামে লাগছে। ঘামের ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে দেহখানাকে যেন বিচিত্র করে তুলেছে। আমি অবাক হয়ে ওকে দেখলাম। কাদা এবং ঘামের রং ও রেখার বৈচিত্র্য নয়—অবাক হলাম লোকটার দেহের গঠন-বৈচিত্র্য দেখে। একজন সুস্থ সহজ মানুষের দেহ এমনভাবে বিকৃত হয়ে যায়। লম্বা একটি মানুষ বোঝা বয়ে খাটো হয়ে যায় এমনভাবে? পা থেকে কোমর পর্যন্ত শরীরের নিচের দিকটা সহজ স্বাভাবিক সরল সোজা পা, প্রতিটি পেশী সুগঠিত। কিন্তু উপরের দিকটা—কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত অংশটা বিপুল চাপ দিয়ে কেউ যেন দেহের কাঠামোটা পর্যন্ত ভেঙে চুরে বিকৃত করে খাটো করে দিয়েছে। চওড়া বুকটা উঁচু হয়ে ঠেলে উঠেছে; পেটটা গিয়েছে ভিতরে ঢুকে—সেখানে দড়ির মত গোটা তিনেক পেশী দাঁড়িয়ে গেছে সেগুলি এখন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসে কাঁপছে। ঘাড়ে মাটির বস্তার জন্য ওর মুখখানা আমি দেখতেই পাচ্ছি না, মাটির দিকে মুখ করে লোকটা হেঁটে চলেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি ওর মাথায় একটা দিক; কদমফুলি ছাঁটে ছাঁটা কাঁচা-পাকা চুলে ভরা প্রকাণ্ড মাথাটার একটা দিক। একটু দ্রুত হেঁটে এগিয়ে গেলাম। এবার নজরে পড়ল—কাদার

প্রলেপের মধ্যে দেখতে পেলাম—ছোট বড় কাটা দাগ,—সংখ্যায় অনেক।

একটা বাড়ি থেকে কেউ ওকে ডাকলে—এই মাটিওলা।

লোকটা ঘুরল সেই দিকে ; আমি তার পিছনে পড়লাম। এবার আমার বিস্ময় উঠল চরমে। ঘাড়ের নিচেই একটা কুঁজ। কুঁজের উপরে একটা খাঁজ তৈরি হয়ে গিয়েছে, তারই উপরে মাটির বস্তা চাপিয়ে লোকটা ভারী-পায়ে পা ফেলে ; কিন্তু চলার ভঙ্গি সহজ—কাঁধে ভার চেপেছে বলে দ্রুত চলছে না, বেশ সহজ চালে চলেছে। মাটির বস্তা বয়ে ঘাড়ে ওর খাঁজ তৈরি হয়েছে—ওর সবল সহজ দেহ ভেঙে-চুরে পিঠে কুঁজ ঠেলে উঠেছে, বুকটা ফুলে ঠেলে বেরিয়েছে—পেটটা ঢুকে গেছে!

ঠিক এই মুহূর্তেই লোকটা ঘাড়ের বস্তা দাওয়ার উপরে নামিয়ে মাটি বেচতে বসল। যুক্তি ও অনুমানের দিক থেকে আশ্চর্য হবার কথা নয়, তবুও আশ্চর্য হলাম, যুক্তি অনুমানের শক্তি বোধ হয় পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল আমার। ঘাড়ের বস্তা নামিয়ে ও লোকটি সহজ মানুষের মত সোজা হতে পারলে না। ঘাড় বেঁকেই রইল—পিঠের কুঁজটা তেমনি উঁচু হয়েই রইল—শুধু মুখটা একটু তুললে মাত্র। নির্বোধ মানুষের মুখ-চোখে স্থূল দৃষ্টি, কিন্তু একটি সুন্দর মানুষের মুখ। মুখের গড়নে বড় বড় চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটি শান্ত মধুর সুন্দর মানুষের সন্ধান বিবর্ণ বিজ্ঞাপনের মত যেন ফুটে রয়েছে। বিস্মিত এবং বেদনাহত হয়ে কতক্ষণ তাকে দেখেছিলাম, সেকথা আজ মনে নেই, অনেক চিন্তাও মনের মধ্যে উঠেছিল, এই যুগের চিন্তাই সে সব, কিন্তু তাও সব আজ স্পষ্ট নয়, পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থাকে অভিসম্পাত দিয়েছিলাম, কোটী

কোটী মানুষকে এইভাবে যারা বঞ্চিত করে রেখেছে শিক্ষা থেকে, সম্পদের ন্যায্য অংশ থেকে, তাদের ধ্বংসকামনাও করেছিলাম—এতে কোন সন্দেহ নেই। আরও অনেক কথা মনে হয়েছিল; সে সব মনে পড়ছে না আজ। না পড়ুক। তবে এর পর যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলে গিয়েছিলাম, তা আজও মনে পড়্ছে! শুধু তাই নয়, ঐ দিন থেকে ওর সঙ্গে আমার মনের একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সম্পর্কই স্থাপিত হয়ে গেছে; যখন মনে হয় ওর কথা—যখনই স্তব্ধ দুপুরের অবসন্ন অবসরে দূরে হোক—কাছে হোক—নগরীর পথে ওর ডাক শুনতে পাই, তখনই একটি দীর্ঘনিশ্বাস আপনি ঝ'রে পড়ে বুক থেকে; শত ব্যস্ততা অথবা একাগ্র চিন্তার মধ্যেও কয়েক মুহূর্তের জন্য সব ভুলে গিয়ে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। শীতের অরণ্যগর্ভ থেকে ঘনিয়ে-ওঠা কুয়াসা যেমন বনস্পতির পত্র-পুষ্পের সূর্যারাধনাকে আচ্ছন্ন আবৃত করে তেমনি ভাবেই একটি উদাসীনতা আমার মনের মধ্যে ঘনিয়ে উঠে সচেতন মনের সকল উদ্যমকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়।

এর পর কতবার ওকে দেখেছি, বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি, বাগবাজার, বউবাজার, পোস্তা, টালা, বেলেঘাটায়—ঠিক এমনি দ্বিপ্রহরে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেছি; তীক্ষ্ণস্বরে এই বেসুরা ভঙ্গিতে ওর হাঁক ভেসে চলেছে—মাটি চাই—মা—টি—ই।

সব দিন দেখতে পাইনি। অনুসরণের স্পৃহা আর নাই। দু'এক দিন চোখে পড়েছে। নুয়ে পড়া ঘাড় এবং ঠেলে ওঠা পিঠের কুঁজের মধ্যবর্তী খাঁজে মাটির বস্তা বয়ে বিকলাঙ্গ মাটিওয়ালা সর্বাঙ্গে কাদা মেখে হেঁকে চলেছে—মা—টি চা—ই মা—টিই!

কয়েক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছি আমি। তারপর চলে গেছি নিজের পথে।

হঠাৎ সেদিন নিতান্ত অসময়ে—একেবারে ভোরবেলা অপ্রত্যাশিত-ভাবে ওর বাসাও আবিষ্কার করলাম। সবে তখন গ্যাসের আলো নিভেছে, রাস্তায় তখনও জল পড়েনি; আমি অভ্যাসমত প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম; বেড়াবার বাঁধাধরা স্থান ছিল পার্ক অথবা গঙ্গার ধার; সেদিন দিকপরিবর্তন করে চলে গেলাম একেবারে খালের ধারে। খালের পোল পার হয়ে গেলাম গঙ্গা এবং খালটার সংযোগস্থলের গেটটার দিকে। পাম্প লাগিয়ে খালের জল মেরে ফেলা হচ্ছিল, খালটা মজে এসেছে, সংস্কার হবে। কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে, দু'ধার জেগে উঠেছে; জল পড়েছে মাঝখানে, তার মধ্যেও মাঝে মাঝে পাঁক, দেখা যাচ্ছে। পোল পার হয়ে খালের ধারে চলেছিলাম। গঙ্গার ওপারে জুট মিলের ইয়ার্ডে এখনও আলো জলছে। হঠাৎ দেখলাম মাটিওলাকে। নুয়ে পড়া ঘাড়, পিঠে কুঁজ, ঠেলে ওঠা বুক···দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। গঙ্গায় স্নান করে একখানা গামছা পরে হাতে একটা জলের ঘটি নিয়ে ফিরছে। আমি থমকে দাঁড়াতেই মাটিওলা সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাইলে। তারপরই প্রসন্ন বিনয়ে হেসে বললে—আজ্ঞা হাঁ, আমি সেই মাটিওলাই বটে। ভাঙা ভাঙা বাংলায় হিন্দি মিশিয়ে কথাটা বললে—হাঁ, ওহি মাটিওলাই আছে হামি বাবুজী। যেন স্নান ক'রে পরিচ্ছন্ন দেহে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বেচারী লজ্জা পেয়েছে!

আমি প্রশ্ন করলাম—কোথাও যাবে বুঝি আজ?

তার স্থূল দৃষ্টিতে বিস্ময় জেগে উঠল আমার প্রশ্নে। বললে—আঁ? যায়েগা? কাঁহা যায়েগা?

—স্নান করে এলে—এই ভোরে—

—হাঁ। এখন রামজীর নাম নোব, উস্‌কে বাদ—দুটো চানা খেয়ে নেব, তারপর চলেগা মাট্টি আনতে। আচ্ছা বাবুজী রাম-রাম।

—রাম-রাম ভেইয়া।

সে চলতে সুরু করে দিলে। কয়েক পা গিয়েই কিন্তু ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—খোকী ভাল আছে বাবুজী? আপনার লেড়কী?

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ওর কথা। আমার বাড়িতে তো খুকী নাই।

—আপনার খোকী! আপ তো বেলিয়াঘাটামে রহেতে হ্যায়? লাল রঙের কোঠী?

বুঝলাম, ও আমাকে বেলেঘাটার কোন লাল রঙের বাড়ীর বাসিন্দে বলে ভুল করেছে। কিন্তু প্রতিবাদ করলাম না। ওরই ভুলের মধ্য দিয়ে পরিচয়ের সুযোগ নিতে চাইলাম। বললাম ভাল আছে।

মুখ ভ'রে হেসে সে বললে—আমি গেলেই ছুটে আসবে। একটি খোলা-ভাঙ্গা বাড়িয়ে দিয়ে বলবে—এক পয়সার মাটি দেও—মাটিওলা। হামি বলে—কি হোবে খোকী? বলে—চুলহামে মাটি দেনে হোগা, মাটিওলা। ছোটা হাতমে একমুঠি মাট্টি—আস চলা যায়ে গা।

এবার সে হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর বললে—য্যায়সা দেখতা হ্যায় না—ওইসাই—ঠিক ওইসাই করেগা উ লোক।

ছোট্ট একটি গিন্নি মেয়ের ছবি আমার চোখেও ভেসে উঠল।

অন্তর ভরে উঠল অনাবিল প্রসন্নতায়। সে এবার ঘটীশুদ্ধ হাত তুলে আমাকে নমস্কার ক'রে বললে—আব যাতা হ্যায় বাবুজী! হাঁ রাম-রাম।

চলে গেল সে। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই রইলাম তার দিকে চেয়ে। খালের এপারটা অপরিচ্ছন্ন, প্রাচীন আমলের ভাঙ্গা বাড়ি, বস্তি, গোলা আর গুদামে ভর্তি। আবর্জনা এবং আগাছার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে গেছে বস্তির পথ। সেই পথে চলে গেল সে।

আবার কয়েকদিন পর ওর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। এবার দেখা হওয়ার পটভূমি একেবারে কল্পনার বাইরে। গিয়েছিলাম পোস্টাপিসে, পোস্টাপিসে একটা লম্বা কিউয়ের মধ্যে দেখি মাটিওলা দাঁড়িয়ে আছে। পোস্টাপিসে ওকে কিউয়ের মধ্যে দেখবার প্রত্যাশা যেন কল্পনার বাইরে। মুহূর্তের জন্য আমার কপাল কুঞ্চনরেখায় ভরে উঠল। পরমুহূর্তে নিজেই একটু হাসলাম, ওরও দেশ আছে, ঘর-সংসার আছে, ইঁটে কাঠে পাথরে মাটির ধুলাকে ঢেকে যে মহানগরী গড়ে উঠেছে, তারও ঘরে মাটির প্রয়োজন হয়; ওই শিক্ষায় দীক্ষায় বঞ্চিত মাটিওলা—ওরও প্রয়োজন হয় ডাকঘরে, এতে বিস্ময়ের কি আছে? কিউটা মনিঅর্ডারের কিউ। টাকা পাঠাচ্ছে দেশে। সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়ে উঠল—ঘুমন্ত বাড়ির খোলা দরজার সম্মুখে চোরের উঁকি মেরে দেখবার প্রবৃত্তির মত। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও আমার মুখের দিকে চাইলে, চোখে ফুটে উঠল অপরিচয়ের বিস্ময়;

শঙ্কিত হ'ল বোধ হয়, কারণ গামছার খুটটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলে। বুঝলাম, একেবারে ভুলে গেছে আমাকে। সেদিনের খোকীর গল্পটা মনে পড়ে গেল। বললাম—পছানতে নেহি ?

নির্বোধের মত উত্তর দিলে—আঁ ?

হেসে বললাম—সেদিন তোমার সঙ্গে খালধারে দেখা হয়েছিল ! বেলেঘাটার খোকী—মাটি কেনে তোমার কাছে—!

আশ্বাসের হাসিতে ওর নির্বোধ মুখখানি ভরে উঠল, বলল—হাঁ—হাঁ। কাল গয়া থা আপনাক কোঠীমে। খোকী কাল আমাকে নেওতা দিয়া।

হেসে আমি বললাম—দেশে টাকা পাঠাবে ?

—হাঁ। দেশমে রূপেয়া ভেজবে।

—এ তো অনেক দেরি হবে। এস আমি তোমার মনিঅর্ডার তাড়াতাড়ি করিয়ে দেব। আমার সঙ্গে আলাপ আছে মাস্টারবাবুর।

—হাঁ ! সে অবাক হয়ে গেল আমার প্রতিষ্ঠা দেখে।

—কই, দেখি তোমার মণিঅর্ডার।

একখানা সাদা ফর্ম আমার হাতে দিয়ে সে বললে—তা হ'লে তুমি এটা লিখে দাও বাবুজী। খুসী হয়েই বাইরের একটা দাওয়ার উপর বসে গেলাম ওকে নিয়ে।

—লিখিয়ে বাবুজী ! রূপেয়া দশঠো। পানেওলী—লছমনিয়া, অকলু মুসহরকে বিটীয়া আমি লিখতে স্থরু করে ওর নামগুলি প্রশ্নের স্থরে বলে গেলাম, ভুল হলে সংশোধনের স্থযোগ পাবে।

—লছমিয়া।

হাঁ।

—অকলু মুসহরকে বেটী।

—হাঁ। গাঁও···। গঙ্গাজীর কিনারমে জাহাজী টিশন।

গাঁও পোস্টাপিস মনে নাই আজ, মনে আছে জিলা পাটনা। তারপর বললাম—অব্ তুমাহারা নাম-পতা বোলো।

—হাঁ। লিখিয়ে, মেওয়ালাল।

—মেওয়ালাল মুসহর?

—নেহি নেহি। মাট্টিওলা লিখিয়ে।

—আচ্ছা। হাসলাম একটু। বাতাও উস্‌কে বাদ। পত্তা বাতাও।

বলে গেল ওর ঠিকানা। বিচিত্র বস্তির সে ঠিকানা।

—অব্—কেয়া লিখনে হোগা বাতাও।

—কুছ্ না।

—কুছ্ না? ইসমে লিখনে কা জাঙ্গা হ্যায়, লিখনে কা একতিয়ার ভি হ্যায়—

—নেহি—নেহি—কুছ্ না। নেহি—নেহি।

সে প্রতিবাদ জানালে। কিছু না। কিছু লিখতে হবে না। আমি ওর মুখের দিকে চাইলাম। ও তখনও ঘাড় নাড়ছিল। আমার চোখে চোখ পড়তেই একটু হাসলে, বিচিত্র সে হাসি। তারপর বললে—আজকের দিনটাই আমার মাটি বাবুজী। কোন কাজ হ'ল না। মাহিনার পহেলা রোজ হামার এই কাজেই যায় বাবুজী! মহাবীর কাহারের মা বলে—বরবাদ করিস দিনটা তুই মেওয়ালাল।

পরের মাসের পয়লা তারিখটা বিশেষ করে খেয়ালে ছিল। মাটিওয়ালার জন্য নয়, তারিখটা স্মরণীয় করে তুলে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার সংসারে আবির্ভূতা হলেন—এক দৌহিত্রী। ধাত্রী ডাক্তার এঁদের বিদায় ক'রে ডায়রীতে লিখছিলাম নবজাতার জন্মের তারিখ, সময় ইত্যাদি। ১লা অগ্রহায়ণ…। হঠাৎ খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল মেওয়ালাল মাটিওলা। আমি বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকালাম। আমার বাড়ি ও চিনলে কেমন করে।

একগাল হেসে মেওয়ালাল বললে—পরণাম বাবুজী।

—রাম রাম ভাই।

—আপ্‌কা কোঠী হম পহছান লিয়া বাবুজী! সে হাসতে লাগল। বললে—বেলিয়াঘাটা তোমার বাড়ি নয়। যো রোজ তোমার সঙ্গে পোস্টাপিসে দেখা তার পরদিন আমি তোমার জন্যে বহুত আচ্ছা গঙ্গাজীর মাটি নিয়ে তোমাকে ভেট দিতে গিয়েছিলাম। টবে ওই মাটি দিয়ে গাছ লাগালে আচ্ছা গাছ হবে। কিন্তু গিয়ে একদম বুড়বক বনে গেলাম। মালিক, ওহি খোকীর বাপ, খোকীর হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল দরজায়। আমি বাবুজী ওহি বাবুজীকেই বললাম—মালিকবাবুকে একটু 'ডেকে' দেবে হুজুর? এই খোকী মায়ীর পিতাজীকে? বাবুজীকে গোস্‌সা হো গিয়া, আরে—বাপরে বাপ! আঁক পাকাকে—বলব কি বাবুজী—বলে—কেয়া কাম হ্যায় তুমহারা? খোকীকে পিতাজী তো হম হ্যায়। হ্যায় রামজী! হম একদম বেওকুব বন গেয়া।

আমি নিজেও একটু অপ্রতিভ হলাম। এইবার যদি ও আমাকে প্রশ্ন করে বাবুজী, তুমি এমন মিথ্যে পরিচয় কেন দিলে আমাকে?—তবে আমি কি উত্তর দেব। সত্য উত্তর মেওয়ালাল কতখানি বুঝবে?

হঠাৎ মনে এসে গেল, আমিও তাই খুলে বললাম—আমি তোমার সঙ্গে জুয়োচুরি কিছু করিনি মেওয়ালাল। মনিঅর্ডারের রসিদ পেয়েছ তুমি?

—হাঁ—হাঁ—হাঁ! বারবার স্বীকার করতে চাইলে যেন কথাটা শুধু বাক্যে নয়—ঘাড় নেড়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে স্বীকার করলে যেন। এর পর অপরাধীর মত হেসে বললে—তোমার কাছে আমার কসুর আমি লুকাব না বাবুজী। প্রথম দিন—বেলিয়াঘাটায় যেদিন দেখলাম খোকীর বাপ তুমি নও, সেদিন আমার বহুত ডর হয়েছিল। মনে হয়েছিল বাবুজী, কি কোন জুয়াচোর হয়তো আমাকে ঠকিয়ে দশ দশঠো টাকা আমার মেরে দিয়েছে। মনিঅর্ডারকে বিল্‌ঠি যেঠো আমাকে দিয়েছে, সেটা হয় তো একদম ভূয়া হবে। পোস্টাপিসে কি ঝুটমুঠ বলে একটা বাজে কাগজ আমাকে দিয়েছে। বাবুজী, বেলিয়াঘাটেছে একদম দৌড়কে-দৌড়কে বাসামে ফিরলাম। বিল্‌টি নিয়ে ছুটে গেলাম একঠো ডাকডরখানামে। ডাকডরবাবুকে বললাম—দেখিয়ে তো হুজুর—ডাগডর সাব, কেয়া লিখা হুয়া হ্যায় ইস বিলটিমে? মেহেরবাণী ক'রে গরীবকে বলে দাও তো গরীব পরবর! তা ডাকডর সাব পড়লে—দেখলাম—ঠিক ঠিক নাম আওর পতা লেখা রয়েছে। ডাগডর আরও বললে—বিল্‌টি ঠিকঠাক্‌ আছে—ডাংখানার মোহর আছে—মাস্টারবাবুকে সহি ভি আছে। খানিকটা ভরসা হল। তবু বাবুজী—পুরা ভরসা পাইনি। রাত্রে ঘুম হ'ত না! ভাবতাম—কলকাতার জুয়াচুরি—একঠো জাল মোহর বানাতে আর কি লাগে? তারপর একদিন রসিদটা ফিরে এল। যেমন সঙ্গে সঙ্গে একঠো খত ভি আসে—তাও এল। তখন বারবার মনে মনে বললাম—সীয়ারামজী—বাবুজীর কাছে আমার কসুর হ'ল—এ পাপের আমি কি করি! তারপর একদিন তোমার বাসা দেখলাম।

দেখলাম বহুত ভারী বাবু আমীর লোকের সঙ্গে তুমি কথা বলছ। আবার এক রোজ দেখলাম সাহেব লোগ বসে আছে তোমার কাছে। দূর থেকে উঁকি মেরে দেখে ফিরে গিয়েছি। আজ ফিন মাহিনাকে পহেলা রোজ বাবুজী—তুমি আমার মনিঅটারঠো লিখে দাও, আর যদি সেদিনের মত জলদি করিয়ে দাও বাবুজী—

মেওয়ালাল হাত জোড় করে দাঁড়াল। আমিও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। সহজ সরল মানুষ—তাই এত সহজে ওর সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। নইলে এই মিথ্যা পরিচয় দেওয়ার পর এ সততাকে বড়-রকমের জুয়াচুরির ভূমিকা ভাবতে বাধা কোথায় ছিল।

বললাম—দাও ফর্ম। কি নাম যেন? লছমনিয়া—না?

—জী। লছমনিয়া, অকলু মুসহরকে বেটীয়া।

লছমনিয়া—অকলু মুসহরকে বিটীয়া—বাড়ি পাটনা জেলার একটা গ্রামে একেবারে গঙ্গাজীর কিনারার উপর।

মেওয়ালালের সঙ্গে সেদিন আলাপ জমে উঠল। মেওয়ালাল বললে—বাবুজী যে লোক—ডেকে আমার দুঃখ লাঘব করে দিল; আমীর আদমী, লিখাপড়া জানা লায়েক আদমী হয়ে আমার মত গরীব মাটিওয়ালার সঙ্গে এমন মিষ্টি কথা বললে—তার কাছে কি কিছু লুকুতে আছে? তোমার কাছে বলি। মনের কথা আমার দুনিয়ায় বলবার লোক পাই না। বহুত রোজ আগে—বলেছিলাম এক সাধুজীর কাছে গঙ্গাজীর কিনারায় এসে একঠো মন্দিরের দাওয়ার আসন গেড়েছিলেন

—তাঁকে বলেছিলাম। আর বলেছিলাম—মহাবীর কাহারের মাকে, আমাদের বস্তিতে থাকে বুঢ়িয়া, সে আমাকে ভালবাসে আপন বেটার মত ; একবার ভারী বেমারী হয়েছিল আমার—ওহি বুঢ়িয়া আমাকে বাঁচিয়েছিল—তাকে বলেছিলাম ! আজ তোমাকে বলি !

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে মেওয়ালাল। বাইরে শীতের ঝরঝরে হাওয়া বইছে। বাড়ির পাশের চাঁপাগাছের পাতা ঝরে পড়েছে সে হাওয়ায়।

"মুসহরের বেটি লছমনিয়ার যে গাঁয়ে বাড়ি—ওই একই গাঁয়ে রতনলাল নামে এক……।" বলতে গিয়ে থেমে গেল মেওয়ালাল। একটু যেন সামলে নিয়ে বললে—বাবুজী—রতনলাল নামে একজন খুব ভাল লোক ছিল। লোকে বলত মুন্সীজী। লিখাপঢ়ি জানত, গোস্বামী মহারাজ তুলসীদাসের রামচরিত কথা পড়ত। গরীব গৃহস্থী ; ঘরে দু'তিনটে গাই ছিল—একটা ভঁইসা ছিল, একজোড়া বয়েলও ছিল, আর গঙ্গাজীর কিনারায় পাঁচ বিঘা ক্ষেত। তারই ছেলে আমি—আমার নাম 'জীওনলাল' ; অই অকলু মুসহরকে বিটীয়া—লছমনিয়া আমার নাম দিয়েছিল—মেওয়ালাল। অকলু মুসহর আমার বাপের ক্ষেতিতে কাম করত—কিষাণ মজদুর ছিল। গাই' মহিষ, বয়েলের সেবা করত ওর বেটী। ওই লছমনিয়া ছেলেবেলা থেকেই আসত আমাদের বাড়ী। পাটকাম করত, ঝুঁটাবর্তন মলাই করত। ওরও মা ছিল না, আমারও মা ছিল না বাবুজী, ছেলেবেলা একসঙ্গে খেলা করতাম আমরা।

রতনলালকে লোকে বলত সুখী মানুষ। কারও সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ছিল না। গাঁয়ের লোক সম্ভ্রম করত। ক্ষেতিতে গঁহু, যব, অড়হর হ'ত প্রচুর। ছেলে মেওয়ালাল বার চৌদ্দ বরিষ উমর থেকেই এমন ক্ষেতির

কাম শিখেছিল আর ওই ক্ষেতি নিয়েই চব্বিশ ঘণ্টা এমন খাটত যে, দু'তিনখানা গাঁয়ের মধ্যে এমন বঢ়িয়া 'ক্ষেতি' আর কারুর ছিল না। তাতে আর আশ্চর্য কি বাবুজী! একজন লোক যদি বারো মাহিনা তিরিশ রোজ ওই ক্ষেতিতে সকাল থেকে সন্ধ্যে ইস্তক বুক দিয়ে পড়ে থাকে, এক কণা ঘাস বের হলে টেনে তুলে মাটিতে পুঁতে দেয়—যাতে ঘাসও যায় আবার জমিও হয় আরও উর্বর; দুহাতে গঙ্গার কিনারায় দিয়ারা ক্ষেতির মাটি ঘেঁটে ঘেঁটে সামান্য 'কঙ্কর' কি 'পত্থল' থাকলে বেছে ফেলে দেয়; পথে ঘাটে এতটুকু গোবর দেখলে কুড়িয়ে এনে ওই 'ক্ষেতি'তে ঢালে, খুরপী আর কোদালি নিয়ে হরদম জমির তরিবত করে তবে ঐ ক্ষেতির সঙ্গে পাল্লা দিতে অন্য ক্ষেতি পারবে কেন? বাবুজী— দুনিয়াতে সকল মায়ের বুকেই ক্ষীর আছে, কিন্তু যে মা পেট ভ'রে খেতে পায়, ভাল মেওয়া চিজ খায়—সে মায়ের বুকের ক্ষীরের পরিমাণ আর গুণের সঙ্গে অন্য মায়ের বুকের ক্ষীরের পরিমাণ আর গুণ সমান হয়, না —হতে পারে?

একটু থামলে মাটিওয়ালা। আমার মুখের উপর দৃষ্টি তুলে মিষ্টি হাসি হেসে বললে—অকলু মুসহরের বেটী লছমিয়া এই কথা শুনেই আমাকে ঠাট্টা ক'রে বলতো—মেওয়াখানেওয়ালী জমিনকে মালিক তুমি— তোমার জমিনমে যে ফসল হয় তার মধ্যেও মেওয়ার পোস্টাই—ওহি লিয়ে তোমার নাম দিলাম আমি মেওয়ালাল।

তখন মেওয়ালালের বয়স হবে ষোল-সতের, ফুল ধরবার আগে গঁহু কি যবের ফসল যেমক লকলকে তেজালো ঘন সবুজ হয়ে ওঠে— তেমনি তখন মেওয়ালালের চেহারা। ক্ষেতিতে খেটে খেটে আর কুস্তি করে গঙ্গাজীতে সাঁতার কেটে গায়ের জোর হয়েছে তেমনি। দুনিয়াতে

কারুর পরোয়া করে না। কিন্তু লছমনিয়ার এই তামাসায় কেমন সরম লাগত। লছমনিয়া হেসে বলত—আরে বাপরে, গাল কপাল যে আনারের দানার মত টসটসে লাল হয়ে উঠল। এ একেবারে খাস মেওয়ালাল তুমি!

লছমনিয়া মেওয়ালালের চেয়ে বয়সে বছর খানেকের বড়ই হবে। তেমনি কি তার চেহারা! দেখে মনে হ'ত পাঞ্জাব দেশের রহনেওয়ালি। এই লম্বা বাবুজী। বাঁশীর মত নাক, পাঞ্জাবী মেয়েদের মতই চোখ ছোট ছোট। গায়ের রঙ কিন্তু কালো। মেয়েটাকে মুসহররা বলত 'সাপিন্'। সাপিনের মতই লম্বা—তেমনি চোঁখ—চেহারাতেও যেমন—ভাগ্যের দিক থেকেও তাই;—ছেলেবেলায় বছর তিনেক বয়সে হয় সাদী, বছর না পেরুতেই বর মারা গেল; তারপর দশ বছর বয়সে হ'ল প্রথম সাগাই—বাবুজী এক মাহিনা যেতে-না যেতে সে স্বামীও মারা গেল, তারপর ফের সাগাই দিলে ওর বাপ্—তখন ওর বয়স বারো। সে এক আশ্চর্য কাণ্ড—ওই সাগাইয়ের। রাত্রেই বর মারা গেল; ইয়া জোয়ান, এই ছাতি, লোকটা হঠাৎ বললে—বুকটা কেমন করছে; বাস্ তারপরই দুহাতে খামচে ধরলে কনের মুখ আর কাঁধ—বারকয়েক গোঁ গোঁ শব্দ করে ঢলে পড়ে গেল। এরপর লছমনিয়াকে কেউ সাগাই করতে সাহস করলে না। বললে—সাপিনকন্যা। মেয়েটাও বাপকে বললে—আবারও যদি সাগায়ের ব্যবস্থা কর, তবে আমি হয় দরিয়ায়ঝাঁপ দেব, নয় তো জহর মানে বিষ খাব।

বাপ বলেছিল—তবে শেষে তোর হবে কি? আমি যখন মরব—তখন—

লছমনিয়া বাপের কথার মাঝখানেই বলেছিল—তুই থাম বুড়োয়া

মনিববাড়ী রয়েছে বাবু জীওনলালজীর ক্ষেতি আছে, খাটব খাব। ক্ষেতে খাটবার তাগদ গেলে জীওনবাবুর নাতি হবে পুতি হবে—ওহি লোকের খিদমদ খাটব—জীওনবাবুজীর বহুজীর সঙ্গে ঝগড়া করব আর বলব আলবাৎ খেতে দিতে হবে—দাও খেতে।

এর পর থেকে জোর করে সে বাপ অকলুর সঙ্গে ক্ষেতে খাটতে আসত। সমানে খেটে যেত। অকলু বসত মধ্যে মধ্যে, ক্লান্ত হলেও বসত, না হলেও বসত মজতুরীর নিয়ম ওটা। তাগদ তোমার যতখানি ততখানি কখনও খাটবে না। না। খাটতে নাই। যা তোমার আয় তাই যদি তুমি খরচ করে দাও তবে আর তোমার থাকবে কি? তাই মজতুরেরা ঠিক এক একটা সময় অন্তর বসে জিরিয়ে নেয় খানিকটা। তবে ফুরাণের কাম যদি হয় তবে সে আলগ্ মানে আলাদা কথা। লছমনিয়া কিন্তু বসত না, সে খেটেই চলত উদয়াস্ত। বসতে বললে বাপকে বলত—বাবু জীওনলালের চেয়ে আমাকে কাম বেশি করতে হবে। আমি দেখিয়ে দেব কি বাবুজীর চেয়ে আমার তাগদ বেশি।

খিল খিল করে হাসত সে।

মাটিওলা বললে—তা' বলে মনে করো না বাবুজী কি মুসহর মেয়েটার মতলব ছিল কিছু। কি মেওয়ালালের মনে কোন পাপ ছিল। আমি তোমাকে সুরজ নারায়ণের হলপ নিয়ে বলতে পারি যে দু'জনেরই ভিতরটা তখন সূর্যের আলোর মতই পরিষ্কার ছিল, গঙ্গাজীর পানির মতই পবিত্র ছিল। আসল ব্যাপারটা ছিল কি জান? এই যে গায়ের জোরের পাল্লা দেওয়া, এটা ওদের দু-জনের সেই ছেলেবেলা থেকেই চলে আসছে। লছমনিয়া ছিল বয়সে বড়, মেওয়ালালের ছেলেবেলার সঙ্গী, ফল মাকড়—এটা ওটা—এই ধর—রঙীন কাঁচের টুকরো, কি

গঙ্গাজীর কিনারায় বালুর ভিতরের ঝিনুক—এই নিয়ে বহুবার শক্তির প্রতিযোগিতা হয়ে গিয়েছে, ওটা ওদের একটা খেলা ছিল। নেহাতই খেলা।

একটু থেমে সে বোধ হয় ভেবে নিলে কিছু। তারপর আবার বললে—আর জীওনলালের তখন এ সব খেয়ালই ছিল না। দেখতে অবশ্য সেও তখন জোয়ান হয়ে উঠছে, হাতের গুলি ফুলে উঠেছে, বুকের দু'পাশে দু'খানা যেন পাথরের চাঁই দেখা দিয়েছে, বৈশাখ-জ্যৈঠের ঘাসে নতুন ডগার মত গোঁফ দেখা দিতে স্থুরু করেছে—কিন্তু ও খেয়াল জাগেনি। ওর এক খেয়াল ক্ষেত! ক্ষেত—ক্ষেত আর ক্ষেত। ক্ষেতে কাজ নাই তবু সে বসে থাকত খানিকটা মাটি হাতে নিয়ে—আপন মনেই পিষত—আর গঙ্গাজীর জলের দিকে চেয়ে দেখত।

জীওনলালের বাপ এতে খুসী ছিল না। তার ইচ্ছে ছিল ছেলে লিখপঢ়া শিখে মুন্সীর কাজ করে, আদালত কি জিমিদারী কাছারি কি কোথাও কলম চালায়। কিন্তু জীওনলালের মগজ ভাল ছিল না। বাপের অনেক চেষ্টাতেও তার কিছু হয় নি, দশ বছর বয়সেই সে লেখা-পড়া ছেড়েছিল—বাপও হাল ছেড়েছিল। মনে দুঃখ থাকলেও সে কথা সে বলত না কারও কাছে। তবে জীওনলাল জানত। এই কারণেই তার বাপ ইদানীং ক্ষেতির ধার দিয়ে হাঁটে না। বসে বসে তুলসীদাস পড়ে, পূজা অর্চনা করে, ক্ষেত থেকে ছেলে ঘরে ফিরলে একেবার মুখ তুলে চেয়ে একটু হাসে—দুঃখের হাসি—আবার কাজে মন দেয়!

জীওনলাল এতে দুঃখ পায়। সে বুঝতে পারে না বাপের এত আক্ষেপ কেন? কি অন্যায় সে করছে? দুঃখ যত পায় তত তার

ক্ষেতের নেশা বাড়ে। এক একদিন ঘরে ফিরে বাপের ওই হাসি দেখে আবার চলে যায় ক্ষেতের দিকে। রাত্রে সে অন্ধকারেই হোক আর জ্যোৎস্নাতেই হোক বসে থাকে ক্ষেতের মধ্যে।

বাবুজী, গঙ্গার কিনারায় আমীর জমিদার এরা বসে হাওয়া খায়, গঙ্গাজীর বুকে ঢেউ ওঠে, পাল তুলে দিয়ে নৌকা যায়—ব'সে ব'সে দেখে—জ্যোৎস্না রাত্রে দরিয়ার জলে ঝিকিমিকি ওঠে—তাহার বাহার দেখে একদম বিভোর হয়ে যায়। তুমিও তো আমীর লোক, তুমিও নিশ্চয় দেখেছ। কিন্তু জীওনলাল ওই ক্ষেতির মধ্যে বসে গঙ্গাজীর যে শোভা দেখেছে তা তোমরা দেখনি; যে আরাম পেয়েছে সে তোমরা পাবে না।

তার চোখের সামনে চাঁদের আলো—দরিয়ার জল—এর সঙ্গে মিশে ভাসত তার ক্ষেতির ফসলের শোভা। একদম্ দুধবরণ জ্যোৎস্নায় যখন গঙ্গাজীর পানি তার কিনারা দূর—দূর—বহুত দূর—হো-হ আকাশের কিনারাতক ঝলমল করত বাবুজী, যখন লোকের মনে হত ইন্দ্রদেওকে হাতী শুড় দিয়ে চাঁদের কলসী ধরে ধরতি মায়ীকে দুধে আস্নান করাচ্ছে, তখন জীওনলাল দেখতে শুধু দুধ নয়, দুধের সঙ্গে খুব অল্প সবুজ কিছুর আমেজ যেন মিশে রয়েছে। তার ক্ষেতির ফসলের সবুজ রঙ দুনিয়ার সব কিছুর মধ্যে দেখতে পেত যেন। দেখত আর দু-হাতে মাটি ডলত। আঃ—সে যে কি মোলাম—কি মিঠা—কি ঠাণ্ডা সে তুমি বুঝবে না বাবুজী! কতদিন ওই ক্ষেতির সেই মিঠে মাটির উপর ঘুমিয়ে পড়েছে জীওনলাল। এ একটা নেশা! ওই ক্ষেতি তার ছিল স্বরগ বাবুজী! যেমনই হোক না কেন দুঃখ—ওখানে গেলেই সে দুঃখ জুড়িয়ে যেত!

বাবুজী, রতনলাল যেদিন হঠাৎ মারা গেল সেদিন জীওনলাল দুনিয়ায় একা। মা নাই, ভাই নাই, বহিন নাই—কে তাকে সান্ত্বনা দেবে? জীওনলালকে সেদিন সান্ত্বনা দিয়েছিল তার ওই ক্ষেতির মাটি। বাপের কাজকর্ম সেরে শ্মশান থেকে ফিরে সে বাড়িতে থাকতেই পারলে না, সন্ধ্যার পর এসে ওই ক্ষেতির মধ্যে বসে রইল। জুড়িয়ে গেল তার মন। ভুলে গেল সে বাপের কথা। জীওনলালকে মন্দ যদি বলতে চাও এ জন্য বল, কিন্তু এ কথাটা সত্যি বাবুজী! তার চোখের সামনে ক্ষেতে গঁহুর চারা বের হ'ল, বড় হ'ল বাতাসে দুলতে লাগল, কৌয়া এল—আরও কত পাখি এল ক্ষেতের ফসল খেতে, সে তাদের তাড়ালে, তারপর ফসল তার চোখের সামনে পেকে উঠল, অকলু, তার বেটি আর জীওনলাল সে ফসল কাটলে, লছমনিয়া মুখ টিপে হেসে বললে—গঁহু নেহি এতো মেওয়া হ্যায়!

সে দিনের কথা আজও জীওনলালের দিব্যি মনে আছে বাবুজী! সে দিনও মাঝরাত্রে অকলু আর লছমনিয়া এরাই এসে ক্ষেত থেকে ঘরে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আরে বাপরে! আজ তোমার বাপ মারা গেল, তার আত্মা এখনও ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে জানে এই ক্ষেতির চারিপাশে ঘুরছে না?

অকলু শুধু হমু পুরে গেল।—হমু! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে চোখ বুজে ঘুমুচ্ছিল। রাত্রে সে ঘুম থেকে উঠল—চোখ বন্ধ করেই হাঁটে।

একটু থেমে একটা বিড়ি খেয়ে মেওয়ালাল বললে—বাবুজী, তুমি তো শুনেছি লিখাপঢ়ি করেছ অনেক। এই গলির লোকদের কাছে আমি শুনেছি। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বলতো এহি দুনিয়ামে কোন্ জিনিসকে জানা সব চেয়ে শক্ত?

প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে চুপ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। মেওয়ালাল আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বললে—মানুষকে বাবুজী গাছপালা জানোয়ার ওদের সঙ্গে সামান্য দিন কারবার কর—ঠিক জেনে যবে ওদের। ওদের মেজাজ চালচলন সব ধরাবাঁধা। মানুষ—আরে বাপরে বাপ! নিজেকেই নিজে জানতে পারে না—তা' পরকে জানবে কি করে? এই জানা হয় কি করে জান? জানা হয় দুঃখের সময়। তোমার যখন খুব দুঃখ হবে বাবুজী—যখন তোমার মনে হবে বুকের ভিতরটা থেকে কলিজা ছিঁড়ে গেল—তখন ঠিক তুমি দুনিয়ার মানুষকে চিনতে পারবে। নিজের মনের খবরও জানতে পারবে সেই দিন। তোমার যে এই শরীর বাবুজী—এই যে তোমার জনম—এ তো একটা ক্ষেতি। তোমার মন বসে বসে এতে বীজ ছড়াচ্ছে। কিন্তু বীজ মাটিতে পড়লেই তো গাছ হয় না—ফাটে না। বীজ ফাটে কখন জান? যখন আকাশে ঘনঘটা আঁধিয়ার করে মেঘ আসে, দুনিয়ার চোখ ঝলসে দিয়ে যখন বিজলী চমকায়, কড়কড় আওয়াজে যখন তিন লোক কাঁপিয়ে দেওতার বজ্জর হেঁকে ওঠে, ঝাপট মেরে ঝড় উঠে যখন সব ওলোট-পালট করে দিয়ে যায়, ধরতি তখন থরথর করে কাঁপে—কিন্তু তখনই তার সারা বুকময় মনের আনন্দে ফাটে লাখো লাখো বীজ। যে সব বীজ বাবুজী মাহিনার পর মাহিনা মাটির অন্দরে শুকায়ে ঝলসেছে—কোন পাত্তা কেউ জানত না—ওই যে ঘনঘট, এই তার লগন, ওহি, লগন্‌মে তারা নিজেকে ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়ে নিজের পাত্তা জানিয়ে দেয়। তারপর যে বীজের যেমন তেজ যেমন তার গোড়ার মাটির সঙ্গে মিল—মিতালী—সে তেমনি বাড়বে।

বাবুজী—অকলু মুসহরের বিটীয়াই বল আর জীওনলাল কি

মেওয়ালালই বল—দু'জনের কেউ না জানত নিজেকে, না জানত কেউ কাউকে। হঠাৎ একদিন তুফান এল জীওনলালের নসীবে। আর সেই তুফানকে আপনার খেয়ালে মুসহরের বিটীয়া আপনার মাথায় টেনে নিলে।

রতনলালের মৃত্যুর মাস চারেক পর; সেটা অগহন মাহিনা বাবুজী, আমার ক্ষেতে তখন গম যব আলু মটর ছোলার বীজ একদফা ফেটে মাটির উপর বেরিয়ে পড়েছে, আশেপাশের দিয়ারা জমিন তখনও সব সাদা, শুধু চষা হয়েছে মাত্র—আমার জমিনে সবুজ রঙ ফুটেছে। সারাদিন ক্ষেতে পাটকাম ক'রে আমি বাড়ি ফিরে চুলাতে আগুন দিয়েছি, দিনে খেয়েছি সত্তু, রাত্রে দুটি ভাত পাকাব, থারিতে চাওর ভিজিয়ে দিয়েছি, কিছু আনাজ নিয়ে কুটতে বসেছি, খাওয়া-দাওয়া সকাল সকাল সেরে যেতে হবে জিমিদারের কছহারী। সেখানে বাবুজী মস্ত হাঙ্গাম।

তুমি তো বাবুজী পণ্ডিত আদমী, দেশকে কানুন তো তোমার সব জানাই আছে, বাপজী আমার ফৌত হয়েছে—এখন জিমিদারের দপ্তরখানায় বাপজীর নামের বদলে আমার নাম কায়েম করতে হবে; সেলামী লাগবে—কেন না, জমিনের মালেক তো জিমিদার, জিমিদার আমাকে রায়ত মেনে নেবে—সেলামী খাজনা নিয়ে আমাকে দাখিলা দেবে তবে জমিন হবে আমার। তবে জিমিদারেরা বাপের বদলে ছেলেকে রায়ত মানতে না বলে না। ভগোয়ানকে বিধান বাপের স্বভাব পায় ছেলে, চেহারা পায় ছেলে, বাপের রোগ পায় ছেলে, বাপের দেনা শোধ করে ছেলে, তখন বাপের ক্ষেত-খামার এই বা ছেলে পাবে না কেন? জিমিদারের এটা মানে। তবে তারা যদি ইচ্ছে করে বাবুজী

তবে না মানতেও পারে। আদালত থেকে 'লুটিশ' জারী করে হুকুম দিয়ে তোমাকে উচ্ছেদ করতে পারে। 'ওহি লিয়ে' জিমিদারের কছহারীতে যাব, তহশীলদার এসেছেন। কিছু ঘিউ তৈরী করে রেখেছি। তহশীলদারের নজরানা ভি ঠিক করে রেখেছি। আজ রাত্রেই কাজটা সেরে নেব। এর আগে কয়েকবারই গিয়েছি। জিমিদারের বাড়ি বিহার শরিফ—তা জিমিদার বলেছেন—হবে। তহশীলদারের সঙ্গেও দেখা সেখানে হয়েছিল—তিনি বলেছেন—হবে!

কুটনো কাটা শেষ করে থালায় ভিজানো চাল ধুয়ে শেষ করেছি এমন সময় বাবুজী আমার নসীবে তুফানের প্রথম ঝটকা যেন আচমকা মারলে ধাক্কা। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল লছমনিয়া। আমি চমকে উঠলাম। অকলুর কদিন বেমারী হয়ে বুড়ো মানুষ অল্পেই ঘায়েল হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে—কদিন। তবে কি—? আমি বললাম—লছমনিয়া

লছমনিয়া বললে—ঝটসে এসো আমি আস্নান করে খানা পাকাচ্ছি, মুসহরের বেটী সে কথা খেয়ালেই আনলে না, আমার হাত ধরে টানলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—অকলু—

—নেহি—নেহি। ক্ষেতিমে—। ক্ষেতে—আমাদের ক্ষেতে দু'জন কালা সাহেবলোক—সঙ্গে আর্দালী। সে হাঁপাতে লাগল—ছোট চোখ দু'টো ঝক্‌মক্ করতে লাগল। দম নিয়ে বললে—ক্ষেতের ভসল মাড়িয়ে তেকাঁটার উপর যন্তর চাপিয়ে দেখছে আর জরীপের শিকলি টানছে—ইধরসে উধর। হারামজাদা, কুত্তার বাচ্চা আবার—।

দাঁতে দাঁতে সে কিস্‌কিস করে উঠল।

বাবুজী, ওই কালা সাহেবলোকের একজন লছমনিয়াকে মন্দ কথা বলেছে। সে একে মুসহরের মেয়ে, তার উপর সে লছমনিয়া—পাঞ্জাবের

রহনেওয়ালীর মত তেজ—সে উত্তরে গাল দিয়েছে। সাহেবটা হাত চেপে ধরতে গিয়েছিল, এক ঝাঁকিতে হাত ছাড়িয়ে সে ছুটে পালিয়ে এসেছে।

খবর শুনে আমার নখ থেকে মাথা পর্য্যন্ত রক্ত যেন বর্ষার দরিয়ার পানির মত ছুটতে আরম্ভ করলে। আমি লাফ দিয়ে পড়লাম। লছমনিয়ার বললে—দাঁড়াও।

সে মাচান থেকে দু'গাছা লাঠি পেড়ে নিয়ে বললে—অব চলো।

জমিনের কাছে এসে বাবুজী আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। শুধু সাহেবরা নয়—জমিদারের তহশীলদারও বরকন্দাজ নিয়ে সরজমিনে হাজির হয়ে গেছে। ধমক দিয়ে এক হাঁক মারলে তহশীলদার—খবরদার! তারপর বললে—আর এক পাও যদি এগুবি চাষার বেটা, তবে তোকে গুলি করে মেরে এই জমিনের মধ্যে পুতে দেব।

মেওয়ালাল এক লহমায় পাথর বনে গেল। লছমনিয়া বলতে গেল হুজুর—আমাদের ক্ষেতের ফসল—

তহশীলদার বললে—নেহি। এ জমি এখন জমিদার সরকারের খাস জমি হয়েছে। সরকার থেকে হুকুম হয়েছে এ জমি জাহাজ কোম্পানীকে বন্দোবস্ত কিয়া যায়েগা। কোম্পানীকে হিঁয়া টিশন বনেগা।

বরকন্দাজেরা ততক্ষণে ক্ষেতের চারিদিকে খুঁটো পুঁতে দখলের লাল নিশান উড়িয়ে দিলে। একটা খুঁটাতে একটা কাগজে লেখা নোটিশও ঝুলিয়ে দিলে।

আমার নসীবের আকাশে চারিদিক ঝলসে দিয়ে বিজলী ঝলকে উঠল—আমার, তামাম দুনিয়া কাঁপিয়ে কড়্‌কড়্ ক'রে বাজ ডেকে উঠল।

আমার কি হয়েছিল, আমি তখন কি ক'রেছিলাম জানি না, লছমনিয়াই আমাকে দু'হাত ধরে টেনে তুলে নিয়ে বললে—চলে আও।

বাবুজী—ঠিক এই সময়েই তুফানের এই সুরুতেই বোধ হয় লছমনিয়ার বুকের অন্দরে বীজ ফাটল।

বাড়িতে ফিরে আমি যত কাঁদলাম সে তত কাঁদলে। মেওয়ালালের দুঃখে সে আগেও কেঁদেছে, কিন্তু এমন ক'রে তো কাঁদে নি। 'শাঙন ভাদো' মাসের মেঘ যেমন 'বর্‌খায়' বাবুজী, বাতাস না, বিজলী না, আওয়াজ না, শুধু ঝির্ ঝির্ ঝিম্ ঝিম্—তেমনি ভাবে, শুধু দরদর করে জলই ঝরে পড়ল তার চোখ থেকে, সারা রাত।

গঙ্গাজীর বুকের উপর দিয়ে কলের জাহাজ—চালায় যে সব কোম্পানী তাদেরই এক কোম্পানীর জাহাজ চলত আমাদের গাঁওয়ের সামনে দিয়ে। আমাদের গাঁওয়ের দেড় কোশ উপরে ছিল জাহাজ কোম্পানীর টিশন ঘাট। ওই টিশন ঘাট আজ কয়েক বছর—বোধ হয় পাঁচ-সাত বছর ধরে ভাঙতে সুরু করেছে। কোম্পানী বাঁশ কাঠ ইট পথর বহুত ঢেলে রাখতে চেষ্টা করেছে গঙ্গাজীর জলের তোড়ের মুখ। কিন্তু হাওয়ার মুখে খড়ের কুটোর মত সে সব ভেসে গেয়েছে। বর্ষার সময়—পনের রোজ বিশ রোজ বাদ এক একদিন চাঙড় ধ্বংসে পড়েছে। এমনিভাবে প্রতি বছরই খানিকটা স'রে স'রে শেষ পর্যন্ত এবছর টিশন ঘাট সরিয়ে ফেলার মতলবই পাকা করেছে কোম্পানী। এর জন্যে এই বছরে বর্ষার সময় কোম্পানীর বড়া-ভারী মগজওলা সাহেবলোক—হুর

রোজ জাহাজে করে গিয়েছে আর এসেছে। দেখে গিয়েছে, কোন জায়গায় নতুন টিশন বানালে পর নিশ্চিন্ত হতে পারবে। এ দিকে গঙ্গাজীর কিনারের গাঁওয়ের যত জমিদার, কোম্পানীর সাহেবলোককে বহুত বহুত ভেট পাঠিয়ে, জাহাজের খানাটেবিলে খানা খাইয়ে, দামী দামী বিলাইতি মদ খাইয়ে আপন আপন সীমানায় টিশন বানাতে রাজী করবার কোশিস অর্থাৎ চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত জিৎ হয়েছে মেওয়ালালের জমিদারের। নসীব, সবই নসীব। মেওয়ালাল এই সার বুঝেছে। নইলে ঠিক যখন স্টেশন বসাবার উদ্যোগ হচ্ছে—তখনই মেওয়ালালের বাপ মরে গিয়ে—একদম কিনারার পাঁচ বিঘা দিয়ারা—তার খাস হয়ে যাবার সুযোগ হবে কেন বল ? এই জন্যেই এতদিন তারা জমিনটা জীওনলালের নামে পত্তন করে নেয় নি।

দুনিয়া আমার আঁধার হ'য়ে গেল বাবুজী। ছেলের মা ম'রে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি। মেওয়ালাল ওই দুঃখটা জানত, ছেলে বয়সে যখন মা তার মারা গেল—তখন ঘরদোর খেলনা—খাওয়া—সব কেমন বিস্বাদ বেরঙ হয়ে গিয়েছিল। কিছু ভাল লাগত না, শুধুই কান্না পেত। আঠার বছরের মেওয়ালালের আবার সেই হাল ফিরে এল। তার জমি—সকাল থেকে সন্ধ্যে ইস্তক যে জমিতে সে বসে থেকেছে, বসে থেকেছে বসে থেকেছে; শুধু ইটের টুকরো—পাথরের কুচি বেছে ফেলেছে, কোদাল দিয়ে একবার কেটেছে—আবার কেটেছে, বারবার কেটেছে মুঠোতে ধ'রে ভুর ভুর ক'রে গুঁড়ো করেছে,—আঃ বাবুজী মেওয়ালালের সে স্বর্গ, দুঃখ ভুলবার জায়গা; বাপ মরে গেলে সেখানে গিয়ে বসে

থেকে সে সান্ত্বনা পেয়েছে, বাবুজী খুব যখন 'শির দুখিয়েছে' মাথার যন্ত্রণায় যখন অস্থির হয়েছে সে—তখন—

উপরের দিকে হাত তুলে মাটিওলা বললে—সূরুয নারায়ণের নাম নিয়ে বলছি বাবু—ঝুট বলছি না। মাথায় যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মেওয়ালাল ওখানে গিয়ে বসলে—যন্ত্রণার উপশম হ'ত। গঙ্গাজীর হাওয়া তো বটেই কিন্তু তার ক্ষেতের শোভায় চোখ মন তার জুড়িয়ে যেত, বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ত সে। ঘুম ভেঙে যখন উঠত—তখন বিশ্বাস কর বাবুজী—মাথার যন্ত্রণা এতটুকু আর থাকত না।

সেই জমি হারিয়ে সে কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেল। সমস্ত রাত্রি তার থেকে একটু দূরে বসে রইল ওই মুসহরের সাপিনকন্যা। সেও কাঁদলে অনেক। মধ্যে মধ্যে অনেক সান্ত্বনা দিলে সে। বললে—এমনি ছাড়বে কেন জমিন? আদালত করো। বলো হাকিমকে—হুজুর এই জমিন কত কষ্ট করে তোমারা হাঁসিল করেছ। বিলকুল কথা ব'লে—বলো—অব হুজুর বিচার কিজিয়ে—ইয়ে জমিন কিস্‌কা হ্যায়?

বাবুজী, আমি হাসলাম, কাঁদতে কাঁদতেই হাসলাম মুসহরের বিটীয়ার কথা শুনে। কি ক'রে জানবে সে কানুনের প্যাঁচ! ভগোয়ান করলে ধরতির সৃষ্টি, রাজা হাঁতি ঘোড়া হাতিয়ার পল্টন নিয়ে সেই ধরতির মালিক হ'ল। সে আবার সেই মাটি দিলে জমিদারকে। এখন বাপের দাদার রোগই তোমাকে বইতে হোক—আর দেনাই শোধ করতে হোক—আর বাপের চেহারাই তোমার মধ্যে দেখা যাক, তার সঙ্গে মাটির মালিকানির সম্পর্ক কি? রাজার হাতিয়ারে ওখানে বাপ বেটার সম্বন্ধ খচাখচ কেটে দিয়েছে। ও কানুন আলাদা! মুসহরের মেয়ে সে কানুন তুই বুঝবি না।

লছমনিয়া ভোরবেলা উঠে চলে গেল। সমস্তটা দিন এল না। মেওয়ালাল গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়ে রইল তহশীলদারের কছহারীতে। কিন্তু মিথ্যে পড়ে থাকা। ফিরে আসতে হল অনেক গালিগালাজ খেয়ে —বেওকুফ! মুরুখ! মুন্সীকে বেটা চাষা! উল্লু কাঁহাকা! আমি কি করব? তুই এতদিন ফেলে রাখলি কেন?

সন্ধ্যায় লছমনিয়া ফিরে এসে বললে—জোড়ো মামলা। জুড়তেই হবে। আমি গিয়েছিলাম কোশভর দূরের গ্রামের এক বুড়ো মুকতিয়ারের মুন্সী সাহেবের বাড়ি। সব বলেছি তাঁকে—তিনি বলেছেন আলবৎ জিত হবে।

তাই করলাম। না করেই বা করি কি? মনের ভেতরটা যে খাক হয়ে যাচ্ছিল। আগুন লেগে গিয়েছিল। চোখের ঘুম গিয়েছে সে আগুনে পুড়ে, পেটের খিদে গিয়েছে ছাই হয়ে তাতেই, মনে হ'ত এই আগুন লাগিয়ে দিই জমিদারের কছহারীতে, তহশীলদারদের ঘরে, জমিদারের পাকা বাড়িতে, জাহাজ কোম্পানীর জাহাজে—তামাম দুনিয়ায় আগুন লাগাতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তা তো পারি না। কাজেই একটা কিছু ক'রে এ আগুনের দাহ থেকে বাঁচতে হবে। বাড়ির যা ছিল রূপার গহনা বিক্রী করলাম, দায়ের করলাম মামলা।

ওদিকে কোম্পানী এসে আমার ক্ষেতের উপর স্টেশন তৈয়ারী করবার মালমসলা এনে ফেললে। জাহাজের পিছনে বেঁধে টেনে নিয়ে এল একটা একটা টিশন, সেটাকে আমার ক্ষেতের কাছে এনে, ক্ষেতটা কেটে ফেলতে সুরু করলে। নিয়ে এল একটা যন্তর। শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে ফেলে দেয়, রাক্ষসের মত হাঁ করে—তেমনি ধারালো লোহার দাঁত নিয়ে নদীর কিনারায় পড়ে একেবারে ঝুঁড়ি ঝুঁড়ি মাটি গিলে—হাঁ

বন্ধ করে উঠে আসে, ফেলে দেয় পাড়ের উপর। কিনারা গভীর হতে লাগল। ওইখানে এনে লাগাবে ভাসা স্টেশনটাকে। উপরের জমি থেকে ফেলে দেবে একটা কাঠের তৈরি শড়কের মত লম্বা সাঁকো। পাড়ের উপরে পাকা ভিত করে তার উপর টিন লাগিয়ে বানাতে, স্থরু করলে মুসাফেরখানা। আর পুঁতলে মাস্তুলের মত লম্বা চার-চারটে শালের লকড়ি, তার মাথায় কপিকল দিয়ে ঝুলিয়ে দিলে মস্ত মস্ত আলো। কিনারা থেকে আধা দরিয়া পর্যন্ত আলো ঝলমল্ করতে লাগল দিনের মত, সেগুলোকে ঘিরে উড়তে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা। সিধা শড়কের মত রাস্তা বানিয়ে দিলে কোম্পানী, সঙ্গাজীর কিনারা থেকে গাঁওয়ের ভিতর হয়ে নিয়ে গিয়ে জুড়ে দিলে সরকারী পাকা শড়কের সঙ্গে। কোথা থেকে—কোথা থেকে আসতে লাগল হরেক হরেক চিজের দোকানী। বাবুজী, গাঁওকে বানিয়ে দিলে তিন-চার মাহিনার অন্দরে ছোটোসে একটা গোলাগঞ্জ। গাঁওয়ের আদমীর মুখ বেড়ে গেল, যাদের জমি ছিল দিয়ারাস, তারা দাম পেলে কোম্পানীর কাছে। তাদের তো বাপ ফৌত হয় নি বাবুজী। তারা ব্যবসা স্থরু করে দিলে। অন্য অন্য লোক আনাজ নিয়ে চেপে বসে রইল, বিক্রী করতে যেতে হবে না গাঁওয়ের বাইরে। যারা গতরে খাটে তারা খাটতে লাগল কোম্পানীর কারবারে, ইমারতে। বাবুজী—মুসহরটুলির পর্যন্ত হাল ফিরে গেল। গায়ে নীল কুর্তা চড়িয়ে মাথায় পাগড়ী বেঁধে তারা হল কুলী। মুসহরদের সর্দার জগন্নুর বেটাকে সাহেব ডেকে কাম দিলে, বানিয়ে দিলে মেট, জগন্নুকে বানালে সর্দার।

শুধু এক মেওয়ালাল—হতভাগা মেওয়ালাল ফকির বনে গেল একদিনে। বাবুজী, রাত্রি হলে ঘরে থাকতে পারত না সে, বেরিয়ে

পড়ত বাড়ি থেকে—গাঁও ছেড়ে—দূরে চলে যেত গঙ্গাজীর কিনারায়-কিনারায়, সেখানে ছিল জঙ্গলের মধ্যে একটা পুরানোকালের পড়ো ভাঙা ইমারত, কোন্ রাজার নাকি বাড়ি ছিল, একঠো ছোটাসে গড় ভি ছিল, সে সব ভেঙ্গে গিয়েছে—জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে, সেখানে লোকে কেউ যায় না, বলে পিরেতলোক ওখানে বাস করে, ওখানকার ভাঙা ইমারত পাহারা দেয় ওখানকার একটা পত্থলের টুকরো যে সরায় তার মুখে লহু উঠে সে মরে যায় , পাছে পায়ে লেগে একটা পত্থল সরে যায় এক অঙ্গুলী—তাই লোকে যায় না সেখানে; যায় শুধু একদিন গঙ্গাজীর পূজার দিন,—সেখানে যায়, সেখানে আছেন গঙ্গাজীর একদম কিনারায় পত্থলের এক পাঁচীলের মত এক বেদী, সেই বেদীর গায়ে আছেন এক মহাদেওজী গঙ্গাধর মহাদেও, যিনি নাকি মাথার জটায় ধরে আছেন গঙ্গামায়ীকে—সেই ভগোয়ান শিবজীকে পূজা দিতে। পূজা দিতে হয় বাবুজী—ফুল—বেলের পাত্তা—ফলমূল—আর চাপাতে হয় বাবা মহাদেওজীর পায়ের তলায় জনা হি এক ঝুড়ি গঙ্গাজীর মাটি। সারা বরিষের অন্দরে—আর কোন আদমীর ওখানে যাবার একতিয়ার নাই। মেওয়ালালের বুকে আগুন জলে বাবুজী, ত্বনিয়ায় তার শান্তি নাই, সে তো জানের পরোয়া করে না;—সে গাঁওয়ের ওই আলো ওই বাজারের হাসিহল্লা সইতে না পেরে চলে যেত সেখানে। মরণ হয়তো হোক। বিশ্বাস কর বাবুজী সে বাউরা আদমীর মত ওই গঙ্গাধরজীর আস্তানে—বুক চাপড়ে চাপড়ে কেঁদে বেড়াত—চিৎকার করে কাঁদত।

—হে গঙ্গাধরজী—মেরে জমিন ! হে মহাদেওজী—মেরে ক্ষেত ! হে দেওতা, মেরে জমিন !—এক এক সময় শুধুই চিৎকার করত—হে ভগোয়ান ! হে ভগোয়ান ! হে ভগোয়ান !

তার কান্না শুনে গঙ্গার বুকে নৌকার মাঝিরা ভাবত পিরেত কাঁদছে তার কন্নার আওয়াজে চমকে শেয়ালেরা ছুটে পালিয়ে যেত পাশ দিয়ে, হুড়ার চলে যেত গোঁ গোঁ শব্দ করে, মধ্যে মধ্যে আঁধারের মধ্যে দূরে দাঁড়িয়ে দেখত, তাদের চোখগুলো জ্বলত জ্বলজ্বল করে; বুনো বরাগুলো চরের মাটি খুঁড়ে কদ্ খেতে খেতে চমকে উঠত, তীরের মত ছুটে চলে যেত জঙ্গলের মধ্যে। মেওয়ালাল গ্রাহ্যই করত না সে সব। সে তখন সত্যিই পাগল হয়ে যেত।

মেওয়ালালজী! বাবু মেওয়ালাল!

এক মুসহরের বেটী লছমনিয়া জানত তার এই ঠিকানা—তার কলিজার অন্দরের এই হাল। মেওয়ালালের ক্ষেত-খামার চলে গেছে, মেওয়ালালের ঘরের যা কিছু ছিল সে সবও গেছে, এখন লছমনিয়া অন্যত্র চাকরী করে। গোটা গাঁওয়ের লোক কাম করছে জাহাজ কোম্পানীর কারবারে, শুধু মুসহরের বেটী ও পথে হাঁটে না, সে চাকরাণীর কাম নিয়েছে ভিন গাঁওয়ে, সেই বুড়া মুকতিয়ারের মুন্সী বাবুর বাড়িতে; সকালে উঠে চলে যায় ফেরে রাত্রে। ফিরে মেওয়ালালের বাড়ী এসে খবর দেয় মামলার। বুড়া মুকতিয়ারের মুন্সী মামলার ভার নিয়েছে, সে নিজে তদ্বির করে; ওই জমিদার ওর উপর মুকতিয়ারের মুন্সী বুড়ার ভারী আক্রোশ, মুকতিয়ারের কেনা এক জমিন জিমিদার মেওয়ালালের জমিনের মতই কেড়ে নিয়েছে কিছুদিন আগে; মুকতিয়ারের মুন্সী বলে—জিমিদারের জিভ আমি নিকালকে ছোড়বে। লছমনিয়া ফেরে সেই সব আশার কথা নিয়ে। মেওয়ালালকে বাড়িতে পেলে বলে সেই সব কথা। না পেলে—গঙ্গার কিনারায়-কিনারায় চলে আসে একা পিরেতের, মত; মুসহরের বেটীর ভয় নাই, এক

ডাণ্ডা হাতে চলে এসে ওই গঙ্গাধরজীর জঙ্গলে ভাঙা গড়ের দেওয়ালের উপর দাঁড়িয়ে ডাকে—মেওয়ালালজী ! বাবু মেওয়ালাল !

মেওয়ালালের কানে ওর আওয়াজ এলে সে খানিকটা ঠাণ্ডা হয়। মেওয়ালালের মনে হয় ওই লছমনিয়া যদি দিন-রাত বসে থাকে তার পাশে, তবে তার বুকের এই দাহ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু বলতে পারে না সে কথা ! লছমনিয়ার আওয়াজ শুনে সে এগিয়ে এসে সাড়া দেয়—লছমনিয়া !

—বাবু মেওয়ালাল। ছি মেওয়ালালজী ! তোমাকে কত বারণ করি, তবু তুমি এসেছ এখানে ? হররোজ আসছ ! আমার কথা শুনছ না তুমি ? বাবু সাব—এখানে—।

মেওয়ালাল হাউ হাউ করে কাঁদে ! লছমনিয়া তার হাত ধরে টেনে পাথরের দেওয়ালের উপর বসায় ; নিজের আঁচলখানা মেওয়ালালের হাতে দিয়ে বলে—নাও চোখ মোছ। তারপর বলতে সুরু করে মুকতিয়ারের মুন্সীবাবুর কথা। মেওয়ালালকে উঠিয়ে বাড়ি ফেরার কথা ভুলে যায়। বলে—মুকতিয়ার বলে, দেখে লেঙ্গে জিমিদারকে। পিচাশ, ঘড়িয়াল্। এত বড় হাঁ মেলে দুনিয়ার রায়তের যথাসর্বস্ব পেটে পুরেও ক্ষিদে মেটে না। এবার আমি একটা লোহার শিক তাতিয়ে ওর মুখে পুরে দেব। পুড়িয়ে খাক করে দোব ওর পেট ! ক্ষিদে ওর খতম করে দোব।

আইনকানুনের কথা মুসহরের বেটী বুঝতে পারে না, সে-সব বলতে পারে না লছমনিয়া। বলে—তোমাকে একদফে যেতে বলেছে বাবুজী !

মেওয়ালাল মুরুখ হলেও মুন্সীর বেটা, সে কানুন বুঝতে পারে কিছু

কিছু। দিয়ারা জমির অবস্থা—রায়তি জমির চেয়েও খারাপ। ওর বন্দোবস্তি রায়তি জমির মত—ঐটুকু শক্তও নয়। তার আশা ছিল না। তবে মুকতিয়ারের মুন্সী বলে দেশের হাল নাকি অনেক বদল হয়েছে। হোক না দিয়ারা জমিন। তিনপুরুষ তোরা এই জমিন ভোগ করছিস, এইটাই হল বড় কথা।

এমন এমন কথা বলে মুকতিয়ারের মুন্সীবাবু যে, মেওয়ালালের ঠাণ্ডা রক্ত চন্‌চন্‌ করে ওঠে! তার আশা হয়। নতুন কিছু বেচে আবার টাকা সংগ্রহ ক'রে মুকতিয়ারের মুন্সীর হাতে এনে দেয়!

সেদিন লছমনিয়া মেওয়ালালের হাতে ঝাঁকি দিয়ে বললে—মামলা ফতে হো গেয়া বাবুজী—মেরে মেওয়ালালজী—!

—ফতে হো গেয়া! চীৎকার করে উঠল মেওয়ালাল! ও—হো! হো—হো! হায়! হায়! গঙ্গাজীর বুকের উপর যাচ্ছিল একটা কেরায়া নৌকা, তার উপরে কারা কেঁদে উঠল! বোধ হয় যাত্রীরা ভয় পেয়েছিল ভাঙা গড়ের পিরেতের কথা কদিন থেকে চারিদিকে খুব জোর ছড়িয়ে পড়েছে।

ওদের ভয়ের কান্না শুনে খিল-খিল করে হেসে উঠল মুসহরের বেটী। পাঞ্জাবের রহনেওলীর মত চেহারা লছমনিয়ার গলার আওয়াজ তুমি শোন নি বাবুজী,—শুনলে বুঝতে পারতে! আঁধিয়ার যেন নেচে উঠল সে হাসির সঙ্গে!

সে বললে—জিমিদারের তহশীলদার আজ নিজে এসেছিল মুন্সীজীর বাড়ী। মামলা যদি আমাদের ফতে না হবে মেওয়ালালজী, তবে তশীলদার এতটা পথ ভেঙ্গে মুন্সীর বাড়ী আসবে কেন? সে নাচতে সুরু

করে দিলে! সেই আঁধিয়ার রাত, কালো লছমনিয়া, মুসহরেরা তাকে বলে সাপিনকন্যা, বাবুজী, আমার আঁখের উপর আজও ভাসছে সে নাচন—সে আঁধিয়ার—; বাবুজী আমিও নাচতে লাগলাম। চীৎকার করলাম কত! লছমনিয়া খিল্-খিল্ করে হাসলে!

হঠাৎ কিনারা আলোয় ভেসে গেল! জাহাজ আসছিল! আমরা দুজনে একেবারে জঙ্গলেভরা পাথরের যে মহাদেওজীর আস্তান তার পিছনে গিয়ে ঢুকলাম। ওখানে ঢুকতে মানা আছে বাবুজী। মহাদেওজীর 'ভূত-পিচাশেরা' সেখানটা পাহারা দেয়। কিন্তু বাবুজী মহাদেওজীর মন্দিরের চূড়ার উপরেও বীজ ফেটে গাছ গজায়, বীজ যে তখন ফেটেছে ওদের বুকের মধ্যে এবং তাহার কেন সে মানা! এইখানে সেই ভূত-পিরিতে ভরা ঘন জঙ্গলের মধ্যে সে মেওয়ালালের হাত চেপে ধরে হঠাৎ খুব চাপাগলায় বললে—মেওয়ালালজী!

গাছের ফাঁকে ফকে আলোর ছোট একটা টুকরো ছটা তার মুখের উপর পড়েছিল। সে মুখের চেহারা দেখে মেওয়ালালের দিশা হারিয়ে গেল, সে যা করলে বাবুজী—তা তার করা উচিত হয়নি, সে বাবুজী—পাগল হয়ে গেল বোধ হয়, সে লছমনিয়াকে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরলে। মুখে শুধু একটি কথা সে বলতে পারলে—পিয়ারী!

অদ্ভুত বাবুজী মেয়েজাত! লছমনিয়া কথা বলে না—বর্তা বললে না, কাঁদতে লাগল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সারাটা রাত কেটে গেল। সকাল হয়ে গেল! সুরুয নারায়ণের ছটা ঝলক দিয়ে উঠল সামনে পূরব দিকে! চোকে আলো লেগে জেগে মেওয়ালাল দেখলে লছমনিয়া নাই! সে ভয় পেলে! ভূত পেরেতের এই আস্তানায় কি হল তার? 'দানা কি দইত' তুলে নিয়ে গেল নাকি?

—মেওয়ালাল! কোথা থেকে ডাকলে লছমিয়া।

—লছমনিয়া!

দেখো তাজ্জব—চলে আও! মাটির ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে লছমনিয়ার!

—কাঁহা—কোথায় তুই?

—সামনে দেখ একটা সুড়ঙ্গ, নেমে এস—

—সুড়ঙ্গ?

সত্যই সুড়ঙ্গ, একখানা পাথর আধখান হয়ে ভেঙে গিয়েছে; একটা প্রকাণ্ড বটগাছের মোটা ঝুরি—পাথর ফাটিয়ে নেমে গিয়েছে নীচে, অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লছমনিয়া। সুড়ঙ্গ অন্ধকার নয়—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লছমনিয়াকে! সে বললে—নেমে এস বটের ঝুরি ধরে।

তাজ্জবই বটে বাবুজী! একটা ফাঁপা সুড়ঙ্গ, জলে কাদায় থিক-থিক করছে; সামনে এক পাথরের দেওয়াল, তা থেকে একটা পাথর আধখানা খসে ঝুলছে, সেই ফাঁক দিয়ে আলো এসে লছমনিয়ার উপর পড়েছে। লছমনিয়া দেখালে আঙুল দিয়ে—দেখো!

দেখলাম, সূরুয নারায়ণের আলোর ছটা বাজিয়ে ঝকমক করে বয়ে চলেছে দরিয়ার পানি!

মুসহরের বেটির চোখও ঝক্‌ঝক্ করছে—সে বললে, ভাল করে খুঁজতে হবে, এখানে নিশ্চয় অনেক টাকা আছে।

মেওয়ালাল শিউরে উঠে বললে—টাকার কাজ নাই লছমনিয়া, টাকা থাকলেই সেখানে হয় থাকবে অজগর, নয় থাকবে যক্ষ।

সে বললে—যেই থাক—আগে থাকব আমি। আমি ওকে পাকড়াব

—তুমি মারবে মাথায় ডাণ্ডা! তার আগে এই দেওয়ালের আধভাঙা পত্থলটাকে ভেঙে, ফেলে দিতে। আলো চাই।

সেই দিন রাত্রেই সে এল দুই গাঁইতিয়া কাধে নিয়ে। মেওয়ালালের হাতে একটা দিয়ে বললে—পাকড়ো।

কিন্তু রাত্রের আঁধিয়ারে কাম হয় না। সুড়ঙ্গের অন্ধকারে আলো দপ করে নিভে যায়। মুকতিয়ারের মুন্সীর বাড়ীর কাম সে ছেড়ে দিলে। ভোরবেলা থেকে পত্থলে গাঁইতিয়া চলতে সুরু হল। বাপরে —সে কি শব্দ! যেন কামান দাগার শব্দ। কিন্তু আশ্চর্য, সুড়ঙ্গের বাইরে কিছু শোনা যায় না। দশ দিনে খসে পড়ল এক পত্থল, আর একটার আধখানা সরল। সেই আলোতে লছমনিয়া খুঁজতে সুরু করলে —কোথায় টাকা! কিন্তু কোথায় টাকা? শুধু হিম হয়ে যেতে লাগল সর্বাঙ্গ! ওদিকে ভিতরের জল দিন দিন বাড়ছে! বর্ষা সুরু হয়েছে। সর্বাঙ্গে কাদা মেখে উঠে এসে শেষে একদিন লছমনিয়া বললে—নসীব মেওয়ালালজী! মিলল না! চলো ঘর।

গঙ্গায় নেমে আস্নান করে দুজনে দু'পথে ফিরলাম। গঙ্গায় সেদিন বান ডেকেছে—পাথরের দেওয়ালের ভিতে এসে ঠেকেছে লাল জল, ফেনা—খড়-কুটো।

বাড়ী এসে সবে পৌচেছি বাবুজী—দেখি আদালতকে পিয়াদ এক লুটিশ হাতে দাঁড়িয়ে। —কি? কিসের লুটিশ? বুকটা ধড়াস করে উঠল বাবুজী!

পিয়াদা বললে—রতনলালের বেটা জীওনলালের এই বাড়ী কোরক হল।

—কোরক? কেন?

—মামলা করেছিল জিমিদারের সঙ্গে। মামলায় হেরে গেছে। তারই খরচার দায়ে কোরক করেছে—মামলার আগে কোরক, কেও কি —ওর তো আর কিছু নাই, বিক্রি করে পালিয়ে পাছে ফাঁকি দেয়—তাই আদালত এই হুকুম দিয়েছে।

—মামলায় হেরে গিয়েছে জীওনলাল ?

হেসে পিয়াদা বললে—উজবুকেরা এমনি করেই হারে। সে তো দশরোজ আগে রায় হয়ে গিয়েছে। মুকতিয়ারের বুঢ়া মুন্সীর সঙ্গে জিমিদারের আপোষ হ'ল—ওর কোন জমিন জিমিদার নিয়েছিল— —ফিরে দিলে—বাস—মুন্সীবুঢ়া একদম গায়েব করলে নিজেকে, উকীল পেলে না টাকা, মামলা হল জিমিদারের মায় খরচা ডিকরি।

খুব একচোট হাসলে পিয়াদা—হ—হা—করে—

জীওনলালও হাসলে—হা—হা—হা—হা করে ওরই সঙ্গে।

বাস্—একদম মগজ বিগড়ে গেল ! জঙ্গলে বসে দিনরাত হাসতে লাগল। হা—হা—হা—হা ! লছমনিয়া মুসহরকে বেটী ডাকলেও সাড়া দেয় না।

লছমনিয়া সেদিন ওর হাত ধরে টানতে স্থরু করলে—বললে, হেসো না ! এস। চোখ তার ঝকমক করছে। মুখখানা হয়ে উঠেছে কি এক রকম !

ঝাঁকি খেয়ে মেওয়ালালের খানিকটা সম্বিত ফিরল—বসলে— কি ?

—দেখো ! আও হামারা স্যথ !

বাবুজী, ওই যে স্থড়ঙ্গের মুখ—ওই মুখের কাছে এনে—দেখালে ভিতরটায় জলে থৈ থৈ করছে। শব্দ উঠছে হুড়—হুড় হুড়—হুড় !

ওই পাঁচীলের পাথর সরেছে—তারই ভিতর দিয়ে ঢুকছে দরিয়ার তুফান।

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আকাশে মেঘ করছে থমথম, ছাইয়ের মত রঙ। ঝিকমিক করে বিজলী চমকাচ্ছে। মেঘ ডাকছে বাবুজী গুম-গুম করে—যেন পুলের উপর দিয়ে চলেছে ডাকগাড়ী তুফান মেল। দরিয়া তখন চলকে চলকে উঠছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে। মেঘের বিজলীর ইসারায় যেন চমকে চমকে উঠছে। মধ্যে মধ্যে উথলে ফেঁপে উঠছে—চলকে পড়ছে যেন। এক এক সময় শব্দ উঠছে—প্রচণ্ড শব্দ। মাটি ধ্বসছে। পাড় ভাঙছে দরিয়া।

সারাটা রাত দু'জনে বসে রইলাম সেই গর্তের ভিতর মুখ রেখে। দেখতে কিছু পাই না—শুধু শব্দ শুনি হড়—হড়—হড়—হড়।

ভোর রাত তখন বাবুজী। ঘুমিয়ে পড়েছিল দু'জনে ওই বর্ষার মধ্যেই বটগাছটার তলায়। দুজনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছিল হঠাৎ যে একটা প্রলয়ের মত আওয়াজ—মনে হল আকাশের মেঘ ভেঙে বোধহয় নেমে আসছে। চমকে উঠেবসল দুজনে। মেঘ নয় বাবুজী—ওই গঙ্গাধর মহাদেওজীর পাথরের বেদী—ওর পাঁচীলটা। লছমনিয়া আমাকে জোরে ঝাঁকি দিয়ে টানলে—বললে, জলদি জলদি—ওঠ—গাছের ওপর উঠে পড়।

গাছের উপর উঠে দেখলাম, তুফানের জলে ভরে গেল ওই পুরানো গড়টা গোটা দরিয়ার বাঁকা মুখ যেন ঘুরে সোজা হয়ে গেল, জল ছুটল তীরের মত। আরে বাপরে—সে কি জল'—সে কত জল—বাসুকি নাগ যেন লাখো ফণা তুলে ছোবল মারতে মারতে এগিয়ে চলল—গাঁওয়ের মুখে। ভেসে যাবে গাঁও।—হে ভগোয়ান।

নেহি। চীৎকার করে উঠল লছমনিয়া।—এ ধারে দেখো। হেসে উঠল সে।

দেখি ওই পাঁচীল ভেঙে গঙ্গাজীর মুখ ঘুরে গিয়ে জাহাজের টিশনঘাট পড়ে গেছে মাঝ দরিয়ায়, আলোর খুঁটিগুলো উপড়ে পড়ছে, মুসাফের খানার টিনের চালাটা ভেসে যাচ্ছে, ওই যে লোহার জবরদস্ত ভাসাটিশন——তার মোটা শিকল ছিঁড়ে পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে ভেসে চলেছে—কোথায় চলেছে কে জানে!

আমিও এবার হা—হা করে হেসে উঠলাম। আমরা দু'জনে নাচতে লাগলাম ওই বটগাছের ডালে—ভূত আর প্রেত্তিনীর মত।—

তিন দিন পর পুলিশের নৌকা এসে আমাদের গিরিপতার করলে। আমাদের কাণ্ড জানাজানি হয়ে গেছে বাবুজী! জাহাজ কোম্পানীর কলের নৌকা তদন্ত করতে এসে দেখেছে আমাদের, দেখে গেছে ভাঙা পাচীল। তার আগেও নাকি আমাদের দেখেছে জাহাজী আলোয়। গঙ্গাধরজীর আস্তানের মুখে মস্ত বাঁক, ওই যে পাথরের পাচীল, ওতেই পানি ধাক্কা খেয়ে ঘুরে চলত, পাঁচীলের নীচে একটা চড়া পড়েছিল—পাতলা চড়া, বর্ষা ছাড়া জল ওখানে থাকত না, কিন্তু বর্ষার সময় জল চড়া থেকে পাঁচীলের গায়ে এসে ঠেকত; তখন কোম্পানী চড়ার সীমানা বরাবর পুঁতে দিত খুঁটির নিশানা—সেই নিশানাকে পাশে রেখে জাহাজকে চলতে হ'ত হুঁসিয়ারির সঙ্গে—না হলে জাহাজের তলা ঠেকে বেধে যাবে ওই চড়ায়। রাত্রে জোর আলো সামনে ফেলে সারং নিজে দাঁড়িয়ে দেখত জাহাজ ঠিক নিশানাকে পাশে রেখে চলেছে কিনা। বাঁকের মুখে আলোটা এসে বরাবর এসে পড়ত ওই ভাঙা গড়ের জঙ্গলে, সেই আলোয় সারং আমাদের কয়েকদিনই দেখেছিল, খালাসী লোকও

দেখেছিল, তারা ভয়ও পেয়েছিল—পিরেত কি দানা-দৈতের খেলা। সারং তুরবীন কষে আমাদের চিনে, হেসেছিল। ভেবেছিল—। যা ভাবে বাবুজী মানুষ—তাই ভেবেছিল। ভাবতে পারেনি—এক জোয়ান আর এক জোয়ানী—তু'জনে এই নিরালা ঠাঁইয়ে এসে গাঁইতিয়া চালিয়ে মহাদেওজীর বেদীর পাথর খসাচ্ছে। তা ছাড়া ওই মহাদেওজীর পাথরের বেদী ও পুরানো পাঁচীলের যে এত দাম তাও বুঝতে পারেনি। কোন দিন কেউ ভাবতে পারেনি যে, পাথরের পাঁচীলের পিছনে আছে এমন সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গটা নাকি এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত সিধা টানা ছিল আগে। এত সব যদি কোম্পানী জানত বাবুজী তবে ওরা হুঁসিয়ার হয়ে যেত। তা হলে বন্দুক নিয়ে সান্ত্রী বসিয়ে রাখত বাবুজী। নিজে থেকে ওরা ওই পাঁচীলকে 'মেরাম্মত' করত। বড়া বড়া লালমুখ সাহেবলোক এসে সব দেখলে। ওহি যে কালাসাহেব—যে নাকি এসেছিল জরীপ করতে, টিশনের জাওগা দেখতে বাবুজী—ওর নোকরী ওহি কসুর লিয়ে এক কলমমে খতম হয়ে গেল।

আমাদের তু'জনের মেয়াদ হয়ে গেল। বড়া আদালতে জুরী নিয়ে বিচার হ'ল বাবুজী। তামাম দেশ ভেসে গিয়েছে। টিশনের পাত্তা পর্যন্ত নাই। বাবুজী, আমার দিয়ারা জমির বিলকুল মাটি গঙ্গাজী খেয়ে নিয়ে পেটে পুরেছে। সেখানে বিছিয়ে দিয়েছে মিহি 'বালুকে' পথ। তার উপর দিয়ে চলেছে এখন গঙ্গাজী।

আমার সাজা হ'ল পাঁচ বছর। লচমনিয়ার হ'ল তু'বছর। সরকারী উকীলসাব সাওয়ালে বললে—যে কাম করেছে তাতে ওদের ফাঁসীতে লট্‌কে দেওয়া উচিত। কে'ওকি, তামাম এক এলাকা বরবাদ করে দিয়েছে—দরিয়ার তুফান।

আমি মনে মনে বলেছিলাম সেদিন—দাও লট্‌কে। কুছ আফশোষ নেহি। জান বাবুজী—জিমিদারের কছহারী গিয়েছে তুফানে, টিশন গিয়েছে, আওর বাবুজী—ওই যে মুকতিয়রের মুন্সী—যে বেইমানী করেছিল তারও বাড়ীঘর—তামাম পড়ে গিয়েছে। আমার আর ফাঁসিতে লট্‌কাতে আফশোষ কি তখন ?

আমার উকীল,—সরকার থেকে দিয়েছিল উকীল—আমি দিই নি, সে বললে—কসুর খুব বড় তাতে আর ভুল কি ? কিন্তু ওরা ও মতলবে পাথর সরায় নি। ওরা কি করে জানবে—এমন হবে ? বড় বড় সাহেব-লোকের মগজে যা আসে নি—সে ওদের মগজে আসবে কি ক'রে ? ওরা সুড়ঙ্গ দেখে—সেখানে খুঁজতে গিয়েছিল টাকা।

জজ বাহাদুর আর জুরী লোক মানলে সে কথা। আর মেনে নিলে—লছমনিয়ার কসুর এতে কম। ভাবলে তারা—আমিই তাকে ভুলিয়ে এ কামে সঙ্গে নিয়েছি। ওকে দিলে দু বছর। আমি খুব খুসী হলাম। ভগোয়ানকে বললাম—এদের তুমি মঙ্গল করো। পরণাম করলাম—গঙ্গামাইকে। পরণাম—তোমাকে লাখো পরণাম মাইজী। আমার উপর অবিচারের তুমি সাজা দিয়েছ। হাসতে হাসতে চলে গেলাম ফাটকে। মগজে আমার সাফ হয়ে গেল বাবুজী। পাচ বরিষ কোথা দিয়ে কেটে গেল জানতে পারলাম না।

কি করে জানতে পারব বল ? তখন যে আমি পেয়েছি। মিল গিয়া হামারা—কি বলছ বাবুজী ? কি পেয়েছি ? লছমনিয়াকে—পেয়েছি আমি। থাক না কেন সে আলাদা জেলে, তবু তাকে পেয়েছি। এ এক মজার পাওয়া বাবুজী। কি করে পায় তা জানি না, তবে পায়। দিন রাত ও আমার আঁখের সামনে থাকত। রাত্রে বাবুজী—

আঁধিয়ারের মধ্যে ওর সঙ্গে সত্যি সত্যি কথা কইতাম আমি। অন্য অন্য কয়েদীলোক—আমাকে বলত, পাগল—বাউরা। আমি হাসতাম। হাসতে হাসতে একরোজ বেরিয়ে এলাম জেল থেকে।

হঠাৎ মাটিওলার চেহারা পালটে গেল। ভুল বললাম। চেহারা ওর আগেই পালটে গিয়েছিল। গল্প বলতে বলতেই পালটে গিয়েছিল। ওর বাঁকা ঘাড়টা যেন সোজা হয়ে উঠেছিল, ধনুকের মত মেরুদণ্ডটা এক অস্বাভাবিক শক্তির টানে যেন ছিঁড়ে—সোজা হয়ে কাঁধের কুঁজটাকে প্রায় অর্ধেকেরও বেশী মিলিয়ে দিয়েছিল পিঠের সঙ্গে; ঠেলে বেরিয়ে আসা বুক—স্বাভাবিক চেহারা নিয়ে চওড়া দেখাছিল যেন;—একজন শক্তিশালী প্রচণ্ড মানুষ—যেন ওর ওই ভাঙাচোরা বিকৃত দেহ কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে কথা বলছিল এলক্ষণ। চোখ দুটোয় দৃষ্টির মধ্যে যে শান্ত শিষ্ট মানুষটি—অহরহ ভেসে থাকে জলের মধ্যে সমাধিস্থ সন্ন্যাসীর মত—তার অস্তিত্বই ছিল না। গল্প বলতে বলতে সে দুই হাতে আমার তক্তপোষের সতরঞ্চি চাদর খামচাচ্ছিল অবিরাম।

সেই চেহারা আবার পালটে গিয়ে—ফিরে এল পূর্বের চেহারা। সেই ভাঙা মানুষ। জীওনলাল যেন আমার চোখের সামনেই হয়ে গেল মাটিওলা মেওয়ালাল। মাটির বস্তা মাথায় বয়ে—মাটির ভিতরের—কাচা-পাথরের কুচিতে কেটে—ক্ষতচিহ্নে ভর্তি হয়ে গেল, ঘাড়ে বস্তা বয়ে বয়ে ক্রমশঃ ঘাড়ের পেশী বেঁকে জমে—বেঁকে গেল, বুকটা ঠেলে বেরুল, বুকের পাঁজরা বেরুল, কাঁধের নীচে হাড় উঁচু হয়ে উঠে কুঁজ তৈরী হ'ল।

মাটি

সুদীর্ঘকাল বৎসরের পর বৎসর মাটি বয়ে ক্ষেতের মালিক জীওনলাল হয়ে গেল মাটিওলা মেওয়ালাল। চোখের দৃষ্টিও গেল পালটে। হয় তো এই মহানগরে এই দীন কাজ ক'রে ক'রে—সেখানেও লাগল মাটির প্রলেপ—ঘোলা চোখে—দীনতাভরা দৃষ্টি উঠল ফুটে ; যাকে আমার মনে হচ্ছে—শান্ত শিষ্ট এবং সুন্দর।

মেওয়ালাল বললে—ফাটক থেকে বেরিয়ে এলাম বাবুজী মনে ঠিক দিয়ে নিলাম কি—গাঁওয়ে ফিরেই মুসহরের বিটীয়াকে নিয়ে তুনিয়াতে ভেসে পড়ব। গাঁওয়ে থাকব না, থাকতে পারব না, চলে যাব ওকে নিয়ে। জাতে ধরমে জলাঞ্জলি আগেই দিয়েছি—এবার ওর ঘরে—ওর রান্না—ওর থারিয়াতে—একসঙ্গে খেয়ে আমিও হয়ে যাব মুসহর। তুনিয়াতে ওই মুসহরের বিটীয়াই তো আমার সত্যি—আর সব তো আমার কাছে ঝুট। ওকে পেলেই আমি পেয়ে যাব তামাম তুনিয়ার মালিকানি! কিন্তু বাবুজী—।

—কি? কি হ'ল লছমনিয়ার? আমি প্রশ্ন করলাম।

—সেও তখন আলগ তুনিয়া পেয়েছে আমরই মত। মুসহরদের সর্দার—জগন্নু—, সে হেসে বললে—তোমার লছমনিয়া সাহেবের বেটার মা হয়েচে। মেমসাহেব বন্ গিয়েছে। তার আগে বলে নি বাবু তুটো কথা। গাঁওয়ের কথা। দেখলাম বাবু নতুন গাঁও বসে গিয়েছে শহরের মত। সব ওই জাহাজ কোম্পানীর দৌলতে বাবু। জাহাজ কোম্পানী আবার গড়েছে নয়া টিশন। বড়া ভারী টিশন হয়েছে এবার। বুঝেছ বাবুজী—মহাদেওজীর আস্তানকে আবার গড়েছে, লোহা দিয়ে—আর কঙ্কর বিলাইতি মাটি দিয়ে, তার কোলে—লোহার জাল দিয়ে বেঁধে বিছিয়ে দিয়েছে বড় বড় পত্থলের চাঁই। টিশনের কিনারা

আগাগোড়া—পাক্কা করে বাঁধিয়ে দিয়েছে! এবার চারটে আলো নয়, শালের লকড়ী নয়, লোহার খুঁটি পুঁতেছে দশ-দশঠো, তাতে জ্বলছে বড় বড় আলো কি টেলিগিরাপ বসে গিয়েছে। বাজার বসে গিয়েছে—শহরের মত; চা-পানিকে দুকান সমেত বসে গিয়েছে দু-তিনটে। বললাম—ভাল—ভাল, ভগোয়ান মালিক, উনকে মর্জি! জীওনলাল—তোর কসুর ভগোয়ান শুধরে দিয়েছেন! ভাল হয়েছে!

দেখতে দেখতেই চলে গেলাম—পই মহাদেওজীর আস্তানের দিকে। ওখানে ওই যে নয়া বাঁধ হয়েছে—সেখানে এক বাংলা বনে গিয়েছে—এই টিশন—এই বাঁধ—তদারকের জন্যে সেখানে থাকে কোম্পানীর এক অপসর এক কালা 'সাহেব'। এইখানেই থাকে মুসহরের বিটীয়া লছমনিয়া।

মুসহরদের সাপিনকন্যা—পাঞ্জাবের রহনেওয়ালীর মত লম্বা। বাংলা থেকে বেরুবামাত্র আমি চিনলাম। কিন্তু কাছে যখন এল তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম। সে কি তার সাজপোষাক। রঙীন ছিটের ঘাঘরা কাঁচুলী রং ধপধপে সাদা কাপড়—ধপধপে সাদা জামা, খসখসে চুলে লম্বা বেণী। সাহেবলোকের আয়া! সাহেবের মেম মরে গিয়েছে—তার দুই ছেলেকে সে মানুষ করে!

সে বললে—তারও বেশী মেওয়ালাল! এস আমার সঙ্গে। বাগানের এক পাশে ছোট ঘর—সেখানে নিয়ে গিয়ে দেখালে বছরখানেকের এক বাচ্চা। বুকে জড়িয়ে ধরে বললে—আমার জীওনকে আঁধিয়ারা রাতের চাঁদ, মেওয়ালালবাবু।

এমন মিষ্টি হাসলে লছমনিয়া যে, সে তোমাকে কি বলব। তারপর বললে—বলতে তার এতটুকু সরম হল না—রলাল—সাহেব আমাকে দিয়েছে। আমার নিজের ছেলে।

তারপর বললে—তুমি সে সব ভুলে যাও জীওনলালবাবু।

আমি আর কিছু বললাম না তাকে। কি বলব? আগেই আমার দু-চোখ জলে ভরে গিয়েছিল ওর কথা শুনে। চলে এলাম। দুখ হল না এমন নয়—হ'ল তবু খুসী হয়েই চলে এলাম। ওর খুসী মুখ দেখে খুসী হয়ে চলে এলাম। ঝুট রাতে নয় বাবুজী, সূরুয নারায়ণ গঙ্গামাইজীর নাম নিয়ে বলছি আমি। এ কথা সাধুকে বলেছিলাম, সাধুজী খুব ঘাড় নেড়েছিলেন—সীয়ারামজীর জয় দিয়েছেন। মহাবীর কাহারের মা শুনে আমাকে ঘেন্না করেছিল, লছমনিয়াকে খারাপ কথা বলেছিল। তুমি কি বলবে আমি জানি না। লছমনিয়া খুসী মুখে আমার—চোখের উপর ভাসছে।

খুসী হয়েই চলে এলাম। চলে এলাম বাবুজী কলকাতায়। ওখানে থাকতে মন চাইল না। আর ওখানের লোকে আমার উপর ভয়ানক চটা। চটবেই তো বাবুজী। আমি তো অনেক কষ্ট ওদের দিয়েছি। কলকাতা এলাম, ভাবলাম—মজুর খাটব কিংবা কোন চাকরী-বাকরী পেলে করব। খাটব খাব। মুসহরের বেটীকে ভাবতে ভাবতেই আমার জীবন কেটে যাবে। কিন্তু হয়ে গেল অন্য রকম। গঙ্গামাইজী তা হতে দিলেন না। প্রথম রোজই বাবুজী, হাওড়া টিশনে নেমে কলকাতায় ঢুকে—কোথা যাব ঠিক করতে না পেরে গঙ্গাজীর ঘাটে বসলাম। আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম, গাড়ী ঘোড়া লোক, এত বড় বড় বাড়ি দেখে কান্না পাচ্ছিল। কেন এলাম এখানে? রাস্তা ঘাটে --কোথাও এতটুকু মাটি নাই, পাথরের—ইটের—লোহার পিচের উপর পা ফেলে শরীর কেমন শিউরে উঠছিল বাবুজী। গঙ্গাজীর ঘাটে বসে থাকতে থাকতে ওসব ভুলে গেলাম। মনে হ'ল—এইতো সেই

গঙ্গাজী ! গঙ্গাজীর এই যে এখানে ঘোলা জল, ওই জলেই আছে তো আমার সেই ক্ষেতির মাটি ! ভাবছি, এমন সময় ভাটি পড়ল গঙ্গায়। আমাদের দেশে ভাটি নাই জোয়ার নাই। আমি অবাক হয়ে দেখলাম। জেগে গেল দু-পাশে কাদা মাটি, চিক্‌চিকে বালি মেশানো মিহি পলি। ঠিক আমার ক্ষেতির মাটি। কি মনে হ'ল—তুলে নিলাম খানিকটা মাটি, দু-হাতে ঘাঁটলাম, পিষলাম, নাকের কাছে এনে গন্ধ শুকিলাম। মনে হল অবিকল সেই মাটি। দু-হাত ভরে মাটি আমি তাল বেঁধে তুলে নিলাম—বাউরার মত। স্নান করে সেই মাটি নিয়ে ঘাট থেকে উঠে এলাম। একটা আস্তানা কোথাও দেখে নিতে হবে। কাদার তালটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ব দুপহর বেলা। ঝাঁ—ঝাঁ করছে রোদ। চলেছি আমি। হঠাৎ, একটা কোঠির দাওয়ায় খেলছিল এক খোকী—সে আমাকে ডাকল—এই। এই মাটিওলা। এই !

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর দোর খুলে বেরিয়ে এলেন এক মাঈজী। বললেন—বাঁচলাম, দাও তো বাবা মাটি।

গোটা তালটাই নামিয়ে দিলাম আমি। মাঈজী বললেন—এতনা নেহি ! চার পয়সার।

বাবুজী এই সুরু হয়ে গেল আমার ব্যবসা। গঙ্গাজী আমার গচ্ছিত ধন আমাকে দিয়েই চলেছেন। আমি নিয়ে তাই বেচি আর খাই। খেয়ে-দেয়েও বাঁচে বাবুজী। তাই থেকে দশটি ক'রে টাকা আমি লছমনিয়াকে ভেজে দিই। লছমনিয়া—পেয়েছে তার ছেলেকে—আমার তো মুসহরের বেটীই সব। ওকে পাঠিয়েও আমার থাকে। যা থাকছে—তাও সব মরবার আগে মুসহরের বিটীয়াকে পাঠিয়ে দেব।

একটু ঘাড় নেড়ে বললে—সে অনেক হবে, হ্যাঁ—অনেক হবে। এই

এত পয়সা। আনি দু-আনি আর পয়সা। মরবার আগে লছমনিয়াকে ভেজে দেব। লছমনিয়া—মুসহরকে বিটীয়া, পাঞ্জাবের রহনেওয়ালার মত লম্বা। সে ওর লেড়কাকে দেবে।

অভিভূত হয়ে ভাবছিলাম। চমক ভাঙল ওরই হাঁকে।

অপরাহ্ণের প্রারম্ভকালের মাধুর্যটুকু যেন আকস্মাৎ চমকে উঠল তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরের বেসুরাভঙ্গির হাঁকে।

—মাটি--চা—ই, মাটি—ই।

মেওয়ালাল? না—এ আর একজন। এমনি ভাঙা-চোরা দেহ। এমনি ক'রেই হেঁকে চলেছে! এও হয় তো মাটি হারিয়ে—মহানগরীতে মাটি কুড়িয়ে—বেচে বেড়াচ্ছে দোরে দোরে—মাটি—চা—ই।

ময়দান

চৌরিঙ্গীতে সন্ধ্যার জনতা জমে উঠেছে। বিষে ও অমৃতে মেশানো জীবন যেন প্রকাণ্ড একটা কড়াইয়ে টগবগ করে ফুটছে। কতটুকু বিষ কতটুকু অমৃত এ নির্ণয় করতে বিধাতা পারেন কিনা তিনিই জানেন কিন্তু মানুষ পারে না, বিচক্ষণতম রসায়নিকও না। গোটা ময়দানটাই যেন একটা বিরাট কটাহ। সেদিন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার বক্তৃতা দিয়েছেন—রাত্রে গোটা ময়দানটা একটা রহস্যপুরী হয়ে ওঠে। রহস্যপুরী বলতে তিনি অবশ্যই বলেছেন অপরাধতত্ত্বের রহস্যের কথা। অন্ধকার জমে থাকে গাছের তলায়—কলকাতা মহানগরীর অন্তরের অপরাধ-প্রবণতা সন্ধ্যার অন্ধকার হওয়ামাত্র সরীসৃপের মত গর্ত থেকে বেরিয়ে ছুটে আসে এখানে অবাধ বিচরণের জন্য। বিমল পড়ে হেসেছিল।

কয়েকদিন আগে সে বসেছিল কার্জন পার্কে। সুরেন্দ্রনাথের মূর্তির নীচে বেদীটায় অন্ধকারে চুপ করে বসেছিল। হঠাৎ এসে জুটল সেখানে বেদের মেয়ে ক'জন আর জনতিনেক রাত্রের অন্ধকারে উল্লাস-প্রয়াসী। বেচারীকে উঠতে হল। এসব তার অজানা নয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদের সে দেখেছে! বেদেদের মেয়েদের উৎপাতে কার্জন পার্কের দক্ষিণদিকের রাস্তাটায় পথ হাঁটা চলে না। শুধু তাদেরই উৎপাত নয়। ভদ্র ঘরের কুমারী মেয়ের মত সেজে মেয়ে-পুরুষে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেদিন তার অন্ধকারের নেশা লেগেছিল। মনে আছে তিথি ছিল অমাবস্যা, আকাশে ছিল মেঘ, সে অন্ধকারের নেশায় সামনের মাঠের

মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিল। মনুমেণ্টের তলায় সিঁড়ির উপর বসে আছে—কতকগুলি লোক। নিস্তব্ধ হয়ে প্রেতের মত বসে আছে।—মধ্যে মধ্যে জ্বলন্ত বিড়ি সিগারেটের আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে। আরও একটু এগিয়ে গেল সে।

একটা গাছের তলায় গিয়ে চুপ করে বসল।

কয়েক মিনিট পরই একজন এসে গাছটার ওদিকের তলায় দাঁড়াল। একটি মেয়ে। বিব্রত হ'ল বিমল। ভাববে উঠে পড়ে বা গলার সাড়া দিয়ে জানিয়ে দেয় নিজের অস্তিত্ব। তার আগেই মৃদুস্বরে সে ডাকলে নেপী। বিমল উত্তর দেবে কিনা বুঝতে পারলে না। মেয়েটি আবার ডাকলে—নেপী! আমি এসেছি! এগিয়ে এল সে বিমলের দিকে। চমকে উঠল এক ঝলক আলো, টর্চের আলো। মুহূর্তে নিভে গেল। শুধু নিভেই গেল না, সঙ্গে সঙ্গে টর্চটা পড়েও গেল মাটিতে, মেয়েটি অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল—বিমলবাবু।

কে?

—আস্তে কথা বলবেন।

—কিন্তু কে—

—আমি—নীলা সেন—এখন নীলা চ্যাটার্জী।

—ও! বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না বিমলের। নীলার মত মেয়ে এখানে? এই অন্ধকারে এই পাপের রাজ্য কলকাতার ময়দানের গাছতলায়? সে প্রশ্ন না করে পারলে না—তুমি এখানে?

—নেপীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

নেপী নীলার সহোদর, রাজনৈতিক দলের কর্মী, সে আত্মগোপন করে রয়েছে।

—ওই নেপী আসছে বোধ হয়।

একটা পেন্সিল টর্চের আলো একটু দূরে জ্বলেই নিভে গেল। একটি সাদা মূর্তি নড়ছে।

—আমি চলি। বিমল উঠে পড়ল।

—দেখা করবেন না নেপীর সঙ্গে ?

—না।

খানিকটা এসে বিমল দেখলে—নেপী আর নীলা দুজনে হন হন ক'রে চলে যাচ্ছে—দক্ষিণ মুখে। বুঝলে সে, নেপী তাকে বিশ্বাস করতে পারে নি! আর একদিন দেখেছিল—আর একজনকে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের কাছাকাছি একটা রাস্তার ধারে গ্যাস পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে পাথরের মূর্তির মত। সে তাকে দেখেও চমকে উঠেছিল! মেয়েটি অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুটি ছোকরা তার চারিপাশে ঘুরছে। এ মেয়েটিকেও বিমল চেনে। মিশ্রা তাকে দাদা বলে, মিশ্রাকে সে ভুলবে কি করে ? মিশ্রাও রাজনৈতিক দলের কর্মী। সেও আত্মগোপন করে আছে। বিমল তার সামনে এসে একটু দূরে দাঁড়াল। মিশ্রা তেমনি অচঞ্চল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। মুখের এতটুকু পরিবর্তন হল না। চোখের দৃষ্টি ফিরল না, ভ্রূ নড়ল না। আশ্চর্য হল না বিমল। কোন সহকর্মীর জন্য দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে অজস্র আশীর্বাদ জানিয়ে সে চলে গেল আপনার পথে।

সে দিন মনে পড়ে গিয়েছিল—এমনি একটা গাছতলায় শহীদ নলিনী বাগচী তিন দিন পড়েছিলেন—অসুস্থ অবস্থায়। কলকাতায় বিগত কালের বিপ্লবের নাটকের কত খণ্ড দৃশ্যের পটভূমি এই রাত্রির ময়দান—তার হিসাব নাই।

তবে ডেপুটি কমিশনারের কথা হিসাবে পুরোপুরি সত্য।

যে কালে নলিনী বাগচী গাছতলায় পড়েছিলেন অসুস্থ অবস্থায়—এই ময়দানের গাছতলা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিল, সে কালের আত্মরক্ষা বিভাগের দৃষ্টিতে নলিনী আচরণ রাজনৈতিক অপরাধ বলে গণ্য ছিল। এ কালে নেপী—মিশ্রা—এরাও রাজনৈতিক অপরাধের জন্য দায়ী। আবার ওরা যদি কখনও রাজনৈতিক অধিকার আয়ত্ত করতে পারে—তখন আর কোন দলের কর্মী এমনিভাবে এই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকবে। শহীদেরা নিজেদের দলকে প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে দিয়ে চলে যায়; যারা থাকে—অধিকার যাদের হস্তগত হয় তখন তারাই এখানকার অপরাধ দলের ভার গ্রহণ করে। ময়দানের অন্ধকারে এমনিভাবেই ঘনঘটার ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটি তারাফুল ফুটবে।

বিমলই হয়তো তাদেরও দেখে মুগ্ধ হবে এমনিভাবেই।

ভাবতে-ভাবতেই চলেছিল বিমল।

হঠাৎ সামনে থেকে কেউ নারী কণ্ঠে বললে—একটু দাঁড়ান তো।

থমকে দাঁড়াল বিমল। মনুমেণ্টের উপর দিকে—এপাশে ভবানীপুর খেলার মাঠ—এ পাশে বাস দাঁড়াবার জায়গা। মধ্যে যুদ্ধের সময় তৈরী রাস্তাটা। সেই রাস্তায় কাঁধে একটা কিছু নিয়ে একটি মেয়ে চলে আসছে। দক্ষিণদিক থেকে আসছে। অস্পষ্ট আলো। তবু বিমল মেয়েটিকে যেন চিনতে পারলে। মেয়েটিকে প্রায়ই দেখা যায় এসপ্ল্যানেডে। একটি ঘুমন্ত ছেলে কাঁধে ফেলে মেয়েটি কার্জন পার্কটা বেড় দিয়ে ঘোরে। এসপ্ল্যানেড ট্রাম-চক্রটায় ঘুরে বেড়ায়। প্রথম দিন বিমল দেখে মনে করেছিল—কোন গৃহস্থবধু। সমস্ত চেহারাটায় তার

একটি নিরপরাধ জীবনের ছাপ মাখানো আছে। মনে হয় একটি গ্রাম বধূ সদ্য কলকাতায় এসে পথ হারিয়েছে।

দু'দিন একদিন অন্তর বিমল এখানে আসে। কলকাতার জীবনকে দেখে। এরপর যতদিন সে এসেছে প্রায় প্রতিদিনই সে দেখেছে মেয়েটিকে দেখেছে ঘুমন্ত ছেলে কাঁধে ফেলে নিরীহ চেহারার একটি মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এসপ্ল্যানেডে, কার্জন পার্কের চারিপাশের রাস্তায়। দেখে ওর ভুল ভেঙ্গে গেছে। হয় পেটের দায়ে নয় পেশায় ও নেশায় ঘুরে বেড়ায় ও! ছেলেটা এমনভাবে ঘুমোয় ; সম্ভবত ঘুমের কোন ওষুধ খাওয়ায়।

মেয়েটিকে চিনিতে পেরে সে ভ্রূ কুঞ্চিত করলে, দাঁড়িয়েছিল থমকে —চলতে আরম্ভ করলে। পিছন থেকে মেয়েটি বললে—দয়া করে একটু দাঁড়ান। বিপদে পড়েছি আমি। কণ্ঠস্বরে আকুতি ছিল তার। সে আকুতি অভিনয় বলেই মনে হ'ল বিমলের। মেয়েটি এগিয়ে এল, দ্রুতপদেই এগিয়ে এল। হাঁপাচ্ছিল, একটু জোরেই হেঁটেছে বিমলকে ধরবার জন্যে।

বিমল বললে—কি হয়েছে আপনার? কি বলছেন?

—একটু এগিয়ে দিন আমাকে। ট্রাম পর্যন্ত।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে বিমল বললে—এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে বললে—ক'জন হিন্দুস্থানী আমার পিছু নিয়েছে।

—অন্ধকারে একলা মাঠের মধ্যে ঘুরলে—এ তো হবেই।

—ট্রামের ওখানে গেলেই আলোর মধ্যে আর কিছু করতে পারবে না আমার।

বিমল আর কোন প্রশ্ন করলে না। মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়েই হাঁটতে লাগল।

আলোকিত এসপ্ল্যানেডে এসে মেয়েটি মুহূর্তে জনতার মধ্যে মিশে গেল। বিমলকে একটি কথা পর্যন্ত বললে না। বিমলও কথা বলার অবকাশ পেলে না, কথা বলবার জন্যই সে যখন পিছন ফিরলে তখন সে তার পিছনে ছিল না, কখন তার সঙ্গ পরিত্যাগ করেছে বিমল জানতেও পারে নাই। একটু সন্ধান করে দেখতেই নজরে পড়ল ওই চলে যাচ্ছে।

পরের দিনও বিমল দেখলে মেয়েটি যথানিয়মে এস্প্ল্যানেডের জনতার মধ্যে থেকে কার্জন পার্কের ছমছমে আলো-আঁধারির রহস্যের মধ্যে মিলিয়ে গেল—সুন্দরদর্শন সরীসৃপের মত সবুজ লাউডগা সাপের মত গাছের পাতার সঙ্গে মিশে গেল যেন।

দু:দিন পর সেদিন একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। কোলে ছেলে নিয়ে হাত তুলে নমস্কার করার উপায় ছিল না—একটু হেসে মুখে বললে নমস্কার!

বিমল কোন উত্তর না দিয়েই চলে গেল পাশ কাটিয়ে। চলে যাচ্ছিল সে চৌরিঙ্গীর দিকে। কিছুদূর এসে তাকে দাঁড়াতে হল, রাস্তায় মোটরের প্রবাহ চলেছে যেন। মিনিট দুয়েক দাঁড়াতে হল। এর মধ্যেই সে এসে তার পাশে দাঁড়াল।

—শুনুন।

চমকে উঠল বিমল।—কি ?

—নমস্কার করলাম। আপনি একটা কথা না বলেই চলে এলেন ?

—এলাম। আপনার সঙ্গে এভাবে আলাপ করবার তো কোন হেতু নেই।

মেয়েটি বললে—দীন দুঃখীকে দয়াও তো করে থাকেন!

—দয়া? বিস্মিত হ'ল বিমল। ঠিক খুঁজে পেলে না, এ কথার কি উত্তর দেবে।

—কিছু খাওয়াবেন আমাকে?

—খাওয়াব?

হ্যাঁ। আজ আর—। মেয়েটি হাসলে। আশ্চর্য অভিনয় করতে পারে মেয়েটি। এমন ব্যঙ্গ মেশানো বেদনা ফুটে উঠল তার হাসিতে যে, তার বোধ হয় তুলনা হয় না বলে মনে হ'ল বিমলের।

বিমল পকেট থেকে একটি টাকা বের করে তার হাতে দিয়ে বললে —এই নিন। যা খুসী হয় খাবেন।

মেয়েটি হাত সরিয়ে নিলে। বললে—না। টাকা আপনার রাখুন খাওয়াবেন তো—চলুন না—কোন হোটেলে—

—না।

তবে মোড়ে ওই ফিরিওয়ালারা খাবার বেচছে—দহি বড়া,—কচুরী। —চলুন খেতে খেতে আপনাকে বলব আমার কথা। আমার অনেক দুঃখ।

চৌরিঙ্গীর পশ্চিম দিকে পার্ক-করা মোটরের সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। কৌতূহলী দর্শকেরা আশেপাশে ভিড় জমাচ্ছিল। বিমল বিব্রত এবং ক্রুদ্ধ হয়েই বললে—চলুন।

কার্জন পার্কের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে খাবারের ফিরিওয়ালারা অপেক্ষাকৃত অভিজাত। চাকা-ওয়ালা হাত-গাড়ীর ওপর খাবার সাজিয়ে তার উপর গ্যাসের আলো জেলে বিক্রী করে। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকেরা এখানে বেশী ভিড় করে। মেয়েরা আঙুল দেখায়—খাবারওয়ালা তুলে ঠোঙার উপর দেয়।

খাবারওয়ালার হাতে একটা টাকা দিয়ে বিমল বললে—ইনি যা খেতে চান দাও।

মুহূর্তে মেয়েটি বাঁ হাত দিয়ে জামার খুঁট চেপে ধরে বললে—না।

—মানে ?

—যেতে পাবেন না।

রূঢ় হয়ে উঠল বিমল।—কেন ? কেন এমন ধারা বিরক্ত করছেন আমাকে ?

—বিরক্ত ? বিরক্ত হচ্ছেন আপনি ?

—হ্যাঁ—হচ্ছি।

একটা বিচিত্র দৃষ্টি—তার চোখে খেলে গেল। একটা বিদ্যুৎ চমকে উঠল যেন। বিমল গ্রাহ্য করলে না, চলে গেল। কিন্তু ট্রামের জন্য দাঁড়াতে হ'ল তাকে। বেহালা বা আলিপুরের ট্রাম যাচ্ছিল। মেয়েটি পাশে এসে দাঁড়াল। বললে—ইচ্ছা করলে মিছিমিছিও অপদস্থ করতে পারি আপনাকে। কিন্তু না, তা' করব না। যান আপনি, চলে যান।

দিন পনের পর। এ পনের দিন বিমলের এস্প্ল্যানেডে যাওয়া ঘটে ওঠে নাই। কয়েক দিন গিয়েছিল বাইরে, ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়ে কয়েক দিন বাইরে বের হয়নি। সেদিন সন্ধ্যায় পরিচ্ছন্ন আকাশ এবং জ্যোৎস্না ওকে ঠেলেই যেন ঘর থেকে বের করলে।

এস্প্ল্যানেডের আলোর মধ্যে জ্যোৎস্না নেই। সে গিয়ে বসল মনুমেণ্টের তলায়। মাঠের ঘাসের উপর জ্যোস্না পড়েছে—ঘাসের ডগাগুলিতে অত্যন্ত ক্ষীণ ঝিকিমিকি ছটা বেজেছে, একটি অপরূপ কোমল শুভ্র

যেন গ'লে এলিয়ে পড়েছে তৃণাস্তরণের শ্যাম লাবণ্যের উপর। বড় বড় গাছগুলির উপরের পাতাগুলিতে ছটা পড়েছে। কিন্তু মনুমেণ্টের চারি-পাশে—নানা বিচিত্র খেলা চলেছে। জন কয়েক বসে চাঁদের আলোয় তাস খেলছে। সম্ভবত জুয়া। জন কয়েক মিলে গাঁজা খাচ্ছো। জায়াপতি হিসেবে দম্পতি কি না কে জানে—ছুটি যুগল রয়েছে, তারা প্রায় নিঃশব্দ হয়ে বসে আছে। মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট দল এসে ঘুরপাক খেয়ে দেখে যাচ্ছে, যুগল ছুটির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘুরে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ তাসওয়ালাদের কলহ বাধল। কলহ ক্রমে প্রবল হয়ে উঠছিল, একজন আর একজনকে মেরে বসল এক চড়। বিমল উঠে পড়ল। এখানে আর বসা যাবে না।

এগিয়ে এসে সে বসল একটা গাছতলায়।

একটা পায়ের শব্দ, নরম খাসের উপর কোন পথিক চলছে। শব্দ এসে বিমলের পিছনেই থামল। বিমল মুখ ফিরিয়ে দেখলে—সেই মেয়েটি, তারই পাশে সে বসে পড়ল।

বিমল ভয় পেলে আজ।

বসে সে বললে—মনুমেণ্টের সামনের রাস্তা থেকে দেখেছি আমি। পিছনটা দেখেই চিনেছি। একবার দেখলে আর আমার ভুল হয় না।

—কিন্তু কি চাও তুমি আমার কাছে? আজ আর সে তাকে আপনি বলে সম্ভ্রম করলে না।

সে বললে—টাকা আর চাইব না আপনার কাছে। বাবাঃ সেদিন যে রাগ আপনার।

—মিছে কথা।

—না। ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ঘোমটা টেনে হাত বাড়িয়ে বললে

—কচি বয়সী মেয়ের হাতে সন্ধ্যে থেকে একটা টাকার চেয়ে অনেক বেশী পড়ে।

—তাও কর ?

—করি বই কি। না হ'লে পাপ করতে হয়।

বিমল ব্যঙ্গ-হাসি হেসে তার মুখের দিকে তাকালে। সে বললে—

—বারবার না-এর ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে অস্বীকার করে সে দৃঢ়স্বরে বললে—না। পাপ আমি করি না।

—তবে রোজ সন্ধ্যায় এমন ক'রে ঘোর কেন এই ময়দানের আবছায়া ভরা রাস্তায় রাস্তায় ?

—কেন ঘুরি ? হাসলে একটু, তারপরে বললে—

সেদিনও ঠিক এমনি রাত্রি ছিল—এমনি চাঁদনীরাত—বাধা দিয়ে বিমল প্রশ্ন করলে—কিন্তু তোমার নাম কি ? কোথায় বাড়ী

—নাম আমার সুষমা। বাড়ী মানে, দেশ কোথায় তা' জানি না। জ্ঞান হওয়া অবধি থাকি কলকাতায়। বাবার নাম জানি না। মা আমার বাবার ঘর ছেড়ে চলে এসেচিল—একথা জানি। তখন না কি আমার বয়স দেড় কি দুই। যে লোকটির কাছে মা থাকত—তাঁকে অল্প অল্প মনে পড়ে। তাকেই বলতাম বাবা! যা পাপ তিনি করে থাকুন, আমাকে কিন্তু তিনি বড় ভালবাসতেন। সুষি বলে ডাকতেন। ভাল ভাল ফ্রক এনে সাজিয়ে মায়ের হাত ধরে রাতদিন এখানে বেড়াতে আসতেন। এ জায়গাটা ছেলেবেলা থেকে আমার চেনা। সে সময় কি

ফুলই ফুটত এই পার্কে। তারপর হঠাৎ তিনি গেলেন মারা। আমার বয়স তখন চৌদ্দ পনেরো।

মাকে বলে গেলেন—সুষিকে গান-বাজনা শিখিয়ো—লেখাপড়া শিখিয়ো—ওই তোমার ভার নেবে একদিন। গানের গলা ভাল, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ—নিজের পথ ও নিজেই করে নেবে।

একটু চুপ করে ভেবে নিলে কিছু। তারপর বললে—বোধ হয় মা আর আমার পালক পিতা যা করেছিলেন তাতে যা পাপ তার বেশীটা ছিল আমার মায়ের। আমার মনে আছে—বাবার—হ্যাঁ বাবাই বলব তাঁকে, বাবার মৃত্যুর কিছুদিন পর একদিন পাড়ার মহিলা সমিতির একজন এসে মাকে বললে—শুনলাম আপনি খুব অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। হঠাৎ স্বামী মারা গিয়ে—

মা মাঝপথে তার কথায় বাধা দিয়ে বলল—কে বললে আপনাকে?

মেয়েটি ভড়কে গেল। বেশ একটু অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মা বললে—স্বামী নিয়ে চিরকাল ঘর আর কে করে?

মেয়েটি বললে—তা বলি নি। বলছি—একলা মেয়েছেলে—মেয়েটিকে নিয়ে বিব্রত হয়েছেন—

—হ্যাঁ, তা হয়েছি। কিন্তু আপনি কে?

—আমি পাড়ারই মেয়ে। এ পাড়ার মহিলা সমিতি থেকে এসেছি আমি।

—মহিলা সমিতি? জামা সেলাই, ঠোঙা তৈরী—? না ওসব আমি পারবও না, দরকারও নেই। তেমন অবস্থা আমার নয়।

মেয়েটি হেসে এবার বললে—বেশ তো। সে সব করে কাজ কি

আপনার? আপনার মেয়ের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা যদি করতে হয়—বলুন। পড়ছে তো?

—ঘরেই পড়ছে। আর গান শিখছে।

—পড়ার জন্যে আমাদের ওখানে ক্লাশ আছে সেখানে দিবেন।

—না—না। ও সবের মধ্যে আমি নেই। দু'দিন পরে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরবে—পরোপকার ক'রে। ওকে আমি সিনেমায় দেবার জন্য তৈরী করছি!

মেয়েটি চলে গেল।

আমি সেদিন অবাক হয়ে গেলাম। চোখে একটা ঘোর লেগে গেল। সিনেমায় নামব আমি? দেওয়ালের গায়ে কাননবালা, সন্ধ্যারাণীর মত ছবি থাকবে আমার? এমনি দেখাবে আমাকে।

বাবা বেঁচে থাকতেই একটা হারমোনিয়ম কিনে দিয়েছিলেন আমাকে। সারাদিন চেঁচাতাম—সা—রে—গা—মা—। সারেগা, রেগামা; সা—সা—রে—রে!

বলতে বলতে হেসে উঠল সে। জানেন, আমাদের পাশের বাড়ীতেই যারা থাকত, তারা শেষ পর্যন্ত অধীর হয়ে একদিন টিন বাজানো স্থরু করলে। আমিও আরম্ভ করতাম—সা—রে—গা—মা ওদের বাড়ী থেকেও অমনি সু'রু হত—ট্যাং—ট্যাং—ট্যাং—ট্যাং।

আজ হাসছি—সেদিন কিন্তু চোখে জল আসত।

ক্রমে গান শিখে গেলাম কিছু কিছু। দু-তিনটে গান বেশ ভাল গাইতে শিখলাম। টিন বাজনাও বন্ধ হল। অবিশ্যি আমি গান শিখলাম, আমার গান শুনে ওরা লজ্জা পেলে, এ ব'লে নয়। গান গাইতে আমি ক্লান্ত হ'লাম না কিন্তু টিন বাজিয়ে ওরা ক্লান্ত হ'ল।

যখন ওরা টিন বাজাত, তখনও আমি থামতাম না, বরং ওদের বাজনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জোর দিয়ে গান গাইতাম, পর্দা চড়িয়ে দিতাম। ওস্তাদও একজন জুটেছিল—বাবার বন্ধু। বাবার মৃত্যুর পর সেই ছিল আমাদের সংসারের একমাত্র বন্ধু। অকপট বন্ধু। আপনার বুদ্ধিমত পরামর্শ দিত সে। সেই মায়ের মাথায় ঢুকিয়েছিল—সিনেমায় দেওয়ার কথা।

সিনেমায় যারা নামে, তাদের সুখ-ঐশ্বর্য তো আলিবাবার গল্পের ডাকাতদের গুহার ধনসম্পদের মত। আমার ওস্তাদ বলত—বুঝেছ না সুষির মা—একবার ছবিতে নামতে পারলে হয়, বাস—চিচিং-ফাঁক।

আমাকে ডাকত সে—শিষ দিয়ে—'সু-সি।'

আমাকে বলত'—খবরদার যেমন তেমন ক'রে কাপড় পরবি নে। ফেরতা দিয়ে কাপড় পরবি। চব্বিশ ঘণ্টা এমনি করে কাপড় পরবি। পলার মালা, পুঁথির দুল, কাঁচের কঙ্কন এনে দিত।

বাবা একটা বড় আয়না কিনেছিল এক সময়, পুরনোই কিনেছিল, সেটার ভেতরটায় ছ্যাকরা-ছ্যাকরা দাগ ধরে চেহারা ভাল দেখা যেত না; আমি সেই আয়নাটার সামনে সেই সব প'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতাম—নাচতাম। একটা ছবির গান—ভারী প্রিয় ছিল—"ভালো না লাগে তো দিয়ো না মন।"

ওস্তাদ বলত—আমায় কিন্তু তোর গানে সুর দিতে হবে। তোকে জেদ ধরতে হবে।

লোকটা পাগল ছিল। বুঝলেন না! নিজের কদরও জানত না। আমাকে ভাবত—কাননবালার চেয়েও আমি নাম করব সিনেমায়।

আমিও তাই ভাবতাম। মা-ও তাই বিশ্বাস করত। এক একদিন

রাত্রে মা ওস্তাদের সঙ্গে বসে পরামর্শ করত, আমি শুনতাম আর বাড়ীর সামনে দেড় হাত ফালি বারান্দায় বসে দু'হাত চওড়া গলিটার মাথার উপরে ফাঁক দিয়ে আকাশে জ্যোৎস্না থাকলে আকাশ দেখতাম, কৃষ্ণপক্ষ হলে তারার ঝিকি মিকি দেখতাম, মেঘলা হ'লে মেঘ কখন চমকাবে চমকাবে তারই অপেক্ষা করতাম।

মা বলতেন—গাড়ী থাকলে কলকাতার বাইরেই ভাল। তাছাড়া টেলিফোন থাকলে ভাবনা কি।

ওস্তাদ বলত—শহরের বাইরে হলে জায়গার ভাবনা কি? ভাল জায়গা আর সিনেমার ষ্টুডিয়োর লাগাও, টালিগঞ্জের রিজেণ্ট পার্ক, কি তার আশেপাশে।—

মা বলত, কলকাতার বাইরে দুঃখ শুধু মাটিরতলার ড্রেনে

—কিস্স্যু ভাবনা নাই! ওসব যা ব্যবস্থা হয়েছে আজকাল।—আমাকে কিন্তু একখানা ঘর দিতে হবে।

—নিশ্চয়। নইলে সব দেখবে শুনবে কে? তাহলে কাল সকালে খুব ভোরে ওকে তৈরী করে রাখব।

—একেবারে ঘড়ি ধরে যেতে হবে।

একজন ডিরেক্টার নাকি দেখতে চেয়েছেন আমাকে।

গেলাম! ভোরবেলায় উঠে সেজেগুজে বেরুলাম। সাজতে তখন শিখে গিয়েছি। রুখু চুল সাদা মিলের কাপড়, টাইট-হাতা টকটকে লাল রঙের ব্লাউজ; মোট কথা একেবারে মডার্ণ মেয়ে। কাঁধে প্ল্যাষ্টিকের ভ্যানিটি ব্যাগ নিলাম ঝুলিয়ে।

ডিরেক্টার বাংলাদেশের মস্ত ডিরেক্টার। দেখে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন—আমি যে রকমটি খুঁজেছি, সে রকমটি নয়।—তবে—।

তবে এসেছ, বলছ—অভাব। তা—ছোটখাটো কিছু দিতে পারি। তাও পারবে কিনা আমার সন্দেহ আছে।

ওস্তাদ সেখানে কেঁচোর মত নিরীহ। মুখে একটিও তার কথা ফুটল না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগল।

ডিরেক্‌টার বললেন—যেদিন কাজ থাকবে, সেদিন দশ টাকা হিসেবে পাবে। বুঝেছ ?

ওস্তাদ বললে···ইয়েস স্যার। তাই হবে স্যার।

বাড়ী এসে ওস্তাদ লাফালে। বললে—ও হ'ল একটা কাক। ও সবারই মাংস খায়—ওর মাংস দুনিয়ায় কেউ খেতে পারে না। কিন্তু ধর্মের কল আপনি নড়বে। দিক না ছোট পার্ট। ওতেই বাজীমাৎ হয়ে যাবে। একজন নামকরা সিনেমা অভিনেত্রীর নাম করে বললে—ওকে ছোট্ট একটা পার্ট দিয়ে নামিয়েছিল গিরিজাবাবু ডিরেক্‌টার। মাত্র পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিল। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে গেল। এক পার্ট করেই বাস বাজীমাৎ। যেদিন বই খুললে, তার তিন দিনের মধ্যে চার চারটে কনট্রাক্ট। একেবারে হৈ—হৈ—রৈ—রৈ। এও ঠিক তাই হবে। বলেই শিস দিয়ে ডাকলে—স্থ—সি !

সবচেয়ে পাগলামী করলে সে—যখন আমায় পার্ট দিলেন ডিরেক্‌টার একটি পাড়াগেঁয়ে নতুন বউয়ের পাট দিলেন।

ওস্তাদ বললে—আজ্ঞে না স্যর। মডার্ণ মেয়ের পার্ট ভিন্ন ও নামবে না।

ডিরেক্‌টার বললেন—ওকে মানাবে না। এতেই ওকে ভলে মানাবে

—না। ও হবে না স্যর। গুড-বাই টু ইওর চ্যারিটি স্যর। দশটা টাকা ঝন ক'রে ফেলে দিয়ে পাগল আমাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে এল।

মা বললে—উঠিয়ে নিয়ে এলে—কিন্তু।

—কিন্তু কিসের? আবার ঠিক করেছি আমি। কালই।

ওস্তাদ পাগল হলেও করিতকর্মা লোক। তিনদিনের দিন নতুন ডিরেক্টারের কাছে নিয়ে গেল। পার্টও পেলাম ওস্তাদের মনের মত। আমারও মনের মত। কলেজের মেয়ে, স্বদেশী ক'রে বেড়ায়। একটা খবরের কাগজের আপিসে স্ট্রাইক হয়েছে—পিকেটিং করেছে সেখানে। পার্ট করলাম। ছবি খুলল। দেখতে গিয়ে নিজেকে দেখেই নিজের ঘেন্না হ'ল ঠিক যেন একটা হাড়গিলের মত কুৎসিত একটা মেয়ে আমি। লোকে টিটকারী দিয়ে উঠল। আমি কেঁদে ফেললাম। ওস্তাদ গাল দিতে লাগল ক্যামেরাম্যানকে।

ব্যস, আমার সিনেমার স্বপ্ন ভেঙে গেল।

দিন কয়েক ধরেই ওস্তাদের সঙ্গে মায়ের পরামর্শ চলল। মা বললে ভোরবেলা উঠে তৈরী হবি। বেরিয়ে যেতে হবে ওস্তাদের সঙ্গে। পাড়ায় বলবি চাকরী পেয়েছিস সকাল-সন্ধ্যে ডিউটি। ফিরবি—আটটা ন'টায়। আবার বেরুবি সাড়ে পাঁচটায়। বুঝেছিস?

সেদিন বুঝিনি। পরে বুঝলাম—অনেক। মায়ের মনের ছিল একটা অদ্ভুত ভঙ্গি। পাড়ায় মা ছিল একা, কারুর সঙ্গে বনাবন্তি ছিল না। আমাকে বলত, কারুর সঙ্গে মিশবি নে। খবরদার! ওরা আমাদের ঘেন্না করে। আমরা পাপী। আমরা গরীব। একদিন ওদের দেখিয়ে দোব আমি।

দোষও হয়তো ছিল না। পাড়ার লোকে হাসত—আমার এই চালচলন দেখে। আমারও রাগ হ'ত। চোখ ফেটে জল আসত।

মা পাড়ার লোকের কাছে মান রাখবার জন্যে এই নতুন ব্যবস্থা

করলে। আমারও ভাল লাগল। ভোরবেলা সেজেগুজে বেরিয়ে যেতাম। পথে পথে ঘুরে পার্কে বসে সকালবেলাটা কাটিয়ে বাড়ী ফিরতাম। ওস্তাদ পথে আমায় ছেড়ে দিয়ে চলে যেত। সকালে একটা কাজ ছিল তার।

সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে থাকত সে। ঘুরতাম পথে পথে সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে আঁকা ছবি দেখতাম।

একদিন মা বললে—আর তো চলে না স্থষি। দু-বছর যা ক'রে চলল—সে ভগবান জানেন।

উপায় আমিই বা কি করব? ভেবে আমিই বা কি উপায় পাব?

মায়ের চোখ হঠাৎ জলতে লাগল। আমি ভয় পেলাম। মা আমার হাত চেপে ধরে বললে—এক উপায় আছে।

—কি বল?

মা বললে, বড়লোকের ছেলে দেখে তাকে তোকে ধরতে হবে। ওস্তাদ দেখিয়ে দেবে। তুই ডেকে তার সঙ্গে আলাপ করবি। তারপর। তারপর তাকে তোকে বাঁধতে হবে। বিয়ে করতে বাধ্য হবে। বড় হয়েছিস, বুঝতে পারছিস সব। এ ছাড়া উপায় নেই।

শরীর শিউরে উঠল। মায়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। মায়ের কথা শুনে যেমন হ'ল ভয় তেমনি আমার রক্তে লাগল নাচন। আমার পাপ কি না জানি না। তবে নিজের স্বামী পৃথিবীর মানুষের মেলা থেকে পছন্দ ক'রে তাকে মুগ্ধ ক'রে আনার মধ্যে নেশা আছে, রক্তে নাচন আপনি লাগে, বুকের মধ্যে রেলগাড়ী ছুটে চলে, কান গরম হয়ে ওঠে; বিশেষ করে ষোল-সতের বছর বয়সে।

ওস্তাদ এনে দিলে একটা ঝোলা। সৌখীন চমৎকার ঝোলা। আর

এনে দিলে কতকগুলো সাবান, সেণ্ট, স্নো। ওই সব বিক্রির অজুহাত নিয়ে আলাপ করতে হবে।

দেড় বছর আগে একটি মডার্ণ মেয়ে ঘুরত কলকাতার পথে। সুন্দর চেহারা, সুন্দর পোশাক দেখলে ডেকে বলত—একটু শুনুন।

দাঁড়াতে হ'তই। ষোল-সতের বছরের একটি মডার্ণ মেয়ে ডাকলে—কোন্ ছেলে না দাঁড়াবে।

—কিছু, সাবান সেণ্ট কিনুন না।

তারপর ধীরে ধীরে একটি গল্প। সত্যি গল্পই! একটু আধটু পালটে বলতে হ'ত। বলতাম—ম্যাট্রিক পাশ করলাম, আশা ছিল স্কলারশিপ পাব। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ। পেলাম না। ভর্তি হয়েছিলাম। ফ্রিশিপও পেয়েছিলাম। কিন্তু ফ্রিশপ পেলেই তো পড়া হয় না। আরও খরচ আছে। মায়ের টি-বি। দেনা হয়ে গেছে। বাবার এক বন্ধু দেনা দিয়েছিল, লোকটা পিশাচ। সে এখন—।

চুপ করে মুখ নামাতাম।

প্রায়ই প্রশ্ন হ'ত এর পর—সে এখন কি করছে? জুলুম?

—টাকা চাইছে ফিরে। চেঁচামেচি করে না; মন্দ কথাও বলে না, মিষ্টি করেই যা বলে, তার চেয়ে মন্দ আর কিছু হয় না। লোকটির বুড়ো বয়সে স্ত্রী মারা গেছে—। বলে—।

কি বলে?

কি বলবে বলুন। আমাকে বিয়ে করতে চায়। অগত্যা এই পথ বেছে নিয়েছি। এত বড় শহরে খেটে খেতে পারব না।

জিনিস বিক্রী হ'ত হয়তো ওই ওতেই আমার জীবনের সব সমস্যা মিটে যেত। একালের ছেলেদের যত খারাপ লোকে বলে বা ভাবে

তা তারা নয়। তারা বিশ্বাস করত আমার কথা—আমাকে সাহায্য ক'রত, বন্ধু-বান্ধবের কাছে বিক্রী করে দিত আমার জিনিস। আমার সঙ্গে দু'চারটে রসিকতা করত, খানিকটা গল্প করত। তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু বিপদ হ'ল অন্য দিকে। বিক্রীর টাকা রোজকার রোজ খরচ হয়ে গেল। আমার ঝোলার জিনিস ফুরিয়ে গেল। যারা জিনিস দিয়েছিল, তারা দাম পেল না। ওস্তাদ অনেক কাঁদাকাটি করলে—তবুও আর দিল না।

তাদের আপিস থেকে বেরিয়ে সেই দিনই দাঁড়িয়ে আছি ফুটপাথে—ভাবছি; একজন চেনা ছেলে এসে বললে—কই, দিন ছ'খানা সাবান।

বললাম—নেই।

—তা হ'লে কাল দেবেন।

—না।

—কি ব্যাপার?

স্পষ্ট খুলে বললাম—জিনিসের টাকা ভেঙে খেয়ে ফেলেছি।

—সে কি?

—দেবেন কিছু টাকা?

—টাকা? কত টাকা?

—এক-শো।

—এ—ক—শো। মাফ করবেন। চলে গেল সে। আমিও চলতে সুরু করলাম। এই এসপ্ল্যানেডের দিকেই। ঘুরতে লাগলাম কার্জন পার্কের চারিদিকে। দু'তিন জনের সঙ্গে দেখা হ'ল।

একজন বললে—দেব। মুখের দিকে চেয়ে বললে—সন্ধ্যের সময় এইখানেই দেখা হবে। পিছনে শিষ উঠল! ঠিক পিছনে পার্কের

রেলিংয়ে হেলান দিয়ে বসেছিল ওস্তাদ। আমার পিছনে পিছনেই আছে সে। সে শিষ দিয়ে উঠল—সু—ষি!

পিঠ চাপড়ে ওস্তাদ বললে— বাহাদুর মেয়ে।

মা বললে—আরও কিছু টাকার জন্যে বলবি।

আমি সমস্ত দিনটা অস্থির হয়ে কাটালাম। যেন জ্বর হয়েছে আমার বুকের ভিতরে একটা উদ্বেগ কেমন কষ্ট হল। সন্ধ্যের আগে সাবান মেখে স্নান করতে গিয়ে হঠাৎ সাবান হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। হাত কাঁপতে লাগল—পাউডারের পাফ তুলে নিয়ে।

কার্জন পার্কের কোণে দাঁড়ালাম।

কতজন পাক দিতে সুরু করল চারিদিকে। ওস্তাদ বসে রইল সামনের ঘাসের উপর।

একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। সে নামল। বললে—এস।

আমি নিঃশব্দে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলাম। ওস্তাদও এসে সামনে দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে বললে—আমি ওর সঙ্গে এসেছি স্যর।

সে আমার মুখের দিকে তাকালে।

আমি বললাম কি যেন, কি বলেছিলাম মনে নেই। বিড় বিড় করে কি দুটো কথা যেন। আমার সর্বাঙ্গ তখন জ্বরে যেন পুড়ে যাচ্ছে। মাথায় বিকার হয়েছে।

এই মাঠটার কোন একটা গাছতলায় সে আমাকে দশখানা নোট হাতে দিলে। বসলাম দুজনে। সে প্রথমে কথা বললে—প্রথমে তোমায় আমি ভাল বেসেছিলাম। কিন্তু—। অন্ধকারের মধ্যেও বুঝতে পারলাম —সে হাসছে।

তারপর সে বললে—যাও, তুমি বাড়ী যাও। এরকম কাজে

বিপদ আছে। বুঝেছে। এই কথা বলবার জন্যেই তোমাকে নিয়ে এসেছি। আমায় যেন কে চাবুক মারলে। আমি উঠেই ছুটতে আরম্ভ করলাম। কাপড়ে আগুন লাগলে মানুষ যেমন ক'রে ছুটে বেড়ায়, তেমনিভাবে ছুটে বেড়াচ্ছিলাম। কোন দিক লক্ষ্য ক'রে নয়—চীৎকার ক'রে নয়—শুধু ছুটছিলাম। আমার হাত চেপে ধরলে ওস্তাদ—বললে, সুষি—সুষি—ছিঃ! ছিঃ!

আমি দু'হাতে নখ দিয়ে তার মুখে আঁচড়ে দিলাম। রক্তাক্ত ক'রে দিলাম মুখখানা। আবার ছুটলাম। ছুটতে গিয়ে পড়ে গেলাম একটা নালার মাধ্যে। দু-দিকে গাছের ডাল এসে পডেছে। অন্ধকার থম থম করছে, দূরে দূরে জ্বলছে, টিম-টিমে গ্যাস-বাতি। পড়ে গেলাম—উপুড় হয়ে। মনে হ'ল পৃথিবী দুলছে, কিসের একটা ঢেউয়ের উপর ছোট একখানা নৌকার মত আছড়ে পড়ে দুলছে; কিছুক্ষণ পর মাথা তুললাম! মনে হ'ল চারিদিকটা পাক খাচ্ছে আলোগুলো ঘুরছে—লাল-নীল আলোর বিজ্ঞাপনগুলো পাক খাচ্ছে—জোরে নয়—আস্তে আস্তে। এক সময় সব থামল।

কে বললে—ওঠ। তুমি পাগল নাকি!

দেখলাম সেই লোকটি দাঁড়িয়ে। বললে—এ পথে তুমি এলে কেন? চল, এসপ্ল্যানেডে তোমায় পৌছে দি। এ কি, এ যে কাদায় একেবারে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভরে গেছে। লোকের সামনে দাঁড়াবে কি ক'রে।

আমিও দেখলাম, আমার নিজের দিকে তাকিয়ে। মনে হ'ল ভিতরটা বাইরে ফেটে বেরিয়েছে।

সে বলল—চল।

ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়েই ছিল; ওস্তাদ শুধু এল না।

এসপ্ল্যানেডে ফিরিওয়ালাদের কাছে একখানা শাড়ী, একটা সেমিজ কিনে একটা হোটেলে আমায় নিয়ে গেল। বললে—স্নান ক'রে, কাপড় জামা পাল্টে এস।

সেমিজের উপর কাপড় ফেরতা দিয়ে পরা চলে না। সাধারণ পুরণো ধাঁচে কাপড় প'রে মাথা হেঁট ক'রে বেরিয়ে এলাম। মুখের পাউডার-স্নো ধুয়ে গেছে—আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে আমার।

সিনেমার পর্দায় হাড়গিলের মত সেই ছবি মনে পড়ল।

সে বসেছিল ঘরের মধ্যে। একখানা ঘরই সে ভাড়া নিয়েছিল এক ঘণ্টার জন্যে। আমি বেরিয়ে আসতেই সে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, বাঃ।

আমার মাথাটা আরও নুয়ে পড়ল লজ্জায়। সে ঠাট্টা করলে। কিন্তু সে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার মুখ তুলে ধরে বললে—বাঃ—কি চমৎকার দেখাচ্ছে তোমায় বল তো! দেখেছ নিজেকে আয়নায়? এর উপর সিঁথিতে যখন চওড়া ক'রে সিঁদুর প'রবে, তখন মনে হবে যেন লক্ষ্মী-ঠাকুরুণটি। চল—এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে দি। বাড়ী চলে যাও। এ-পথে এস না এমন বিশ্রী সেজে—ছি!

হোটেল থেকে যখন বের হই, তখন একজন তাকে বলেছিল—আরে তুমি এখানে? এ পথে? সত্যিই তুমি?

সে বলেছিল—সত্যিই আমি প্রদ্যোৎ বসু। তোমার দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে নাই। অনুমানও তোমার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয়—তবে। যাক সে কথা—মেয়েটিকে আমার ভাল লেগেছে!

—বান্ধবী?

—তাই।

আমি আড়চোখে তার মুখের দিকে না তাকিয়ে পারিনি? তার ঠোঁটে মাথামাখি করা সে হাসি! মেয়েটি চুপ করে গেল।

তাকে খুঁজতেই আমি আসি। একবার যে সাজে তার আমাকে ভাল লেগেছিল—সেই সাজে। সিঁথিতে সিঁদুর সেদিন ছিল না। সিঁদুর পরছি মোটা করে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত। প্রায়ই আসি। মধ্যে মধ্যে হতাশ হই। তখন কয়েকদিন আসি না। আবার মনে জেগে ওঠে আগুন। আবার আসতে আরম্ভ করি।

ছেলেটা ভাড়া-করা। ওই ওস্তাদই ভাড়া করে দিয়েছে। সন্ধ্যেবেলা কি যেন খাইয়ে দেয় দুধের সঙ্গে। ভিখারী মায়ের ছেলে। মা মরে গেছে। সেও খালাস পেয়েছে—আমিও নিশ্চিন্ত। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে তাকে খুঁজি। ছেলেটা ফাঁকে থাকে। একজন দু'জন ভদ্রলোক পেলে —তাদের কাছে ভিক্ষা চাই। গল্প একটা তৈরী আছে। বলি আমার ছেলে এটা—স্বামী পঙ্গু। দু-একজন বাড়ী পর্যন্ত দেখতে গেছে। কিন্তু তাতেও ঠকেছে। ওস্তাদের কাছেই থাকি। সে গলির মোড়ে আমাকে লোক সঙ্গে দেখলেই বিছানায় শুয়ে কাতরায়। বড় ভাল লোক। বলেছে—যদি তার দেখা পাস—কিম্বা যদি ভুলই তুই করিস—তবে তার জন্যে সুখি তুই ভাবিস নে। আমি আমার জাত-খেতাব দিয়ে যাব। রেশনকার্ডেও লিখিয়াছে সে আমার স্বামী। এতেই চলে যাচ্ছে। তবে—। চলবে না শেষ পর্যন্ত। অথচ—

অথচ দেখুন, যে সম্বলের কথা ভাবছি—সে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছে। শুধু একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। এখানে তার আসার কথা, আগে সে আসত! কিন্তু কে জানে—সে বেঁচে আছে কিনা!

বিমল ওর গল্পে বিশ্বাস করে নাই। খানিকটা হয়তো সত্য, কিন্তু কার্জন পার্কের চারিদিকে রাত্রের অন্ধকারের মাধ্য পাপ যখন প্রেত-পুরীর অশরীরীদের মত আলো-আঁধারির মধ্যে, স্বচ্ছন্দ-বিচরণে ঘুরে বেড়ায় তখন একটি কুমারী মেয়ে স্বপ্ন-বিহ্বলার নত যে তরুণ তাকে প্রত্যাখ্যান করে অপমান করেছিল, তাকে খুঁজে বেড়ায়—এ একেবারে অসম্ভব বলেই মনে হয়েছে তার।

তবু সে তাকে সেদিন দশটা টাকা দিয়েছিল।

সে সেদিন তার পায়ের ধুলো নিয়ে হেসে বলেছিল—আবার যেদিন নেহাত অভাব পড়বে, সেইদিন আপনাকে ধরব।

হেসে বলেছিল—যাবেন একদিন আমার বাসায়। দেখে আসবেন ওস্তাদকে। দেখবেন বিছানায় শুয়ে কেমন পঙ্গু সাজে।

বিমল এসপ্ল্যানেডে গিয়ে সাবধানে ঘুরতে লাগল এর পর।

সে কিন্তু ঘোরে। কাঁকে ছেলে নিয়ে একটু কাত হয়ে পদক্ষেপে ক্লান্তি এবং কাতরতা ফুটিয়ে ঘোরে। আজ ঘোরে, কাল ঘোরে, রোজ ঘোরে—কার্জন পার্কের পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম দিকে চলে যায়, গাছের তলার অন্ধকারে মিশে যায়, আবার আলোর নীচে ফুটে ওঠে আবার ডুবে যায় অন্ধকারে—একটু কাত হয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে—ওই চলে গেল পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে। চমৎকার একটি মিথ্যাবাদিনী।

বেদের মেয়ে

দারোগা বললেন, এ তুই কি করলি বল্ তো ?

কি করব ? নইলে যে ভোলাকে তোমরা ধ'রে ফেলতে।

শিবি বেদিয়ানীর মুখে হাসি খেলে গেল। হ্যাঁ, খেলেই গেল, এমন ভাবে চকিত ঠোঁটের দুটি পাশ ঈষৎ বিকশিত হওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে উল্টে যাওয়া এবং পরক্ষণেই মিলিয়ে যাওয়া, একে খেলে যাওয়া ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

এমন একটা ভাল লোক, তাকে—। দারোগা অপেক্ষা গম্ভীরতার কথা শেষ করতে পারলেন না।

শিবিও এবার বিষণ্ণ হ'ল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে রইল। নীরবে সে অপরাধ যেন স্বীকার করলে। মাথা হেঁট করে হাজতের মাটির উপর নখের দাগ কাটতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে বললে, তোমরা তো জান গো! কি করব ? ভোলার জন্যে আমি মরতে পারি।

দারোগাবাবু হাসলেন, বললেন, এতটা জানি না।

ঝিক্‌মিক্ ক'রে উঠল শিবির ছোট চোখ দুটো।

বেদিয়াদের মেয়ে শিবি। এখানকার বিখ্যাত চোর চন্দর বেদিয়ার ভাগ্নীর মেয়ে।

তিন পুরুষ আগে, অর্থাৎ চন্দর বেদিয়ার বাপ, দলের সঙ্গে এদিকে এসেছিল। তার পর এক বিচিত্র ঘটনার সংঘটনে এখানে থেকে গিয়েছিল।

চন্দরের বাপের হয়েছিল অসুখ। কঠিন কোন আগন্তুক ব্যাধি অর্থাৎ কোন কঠিন ব্যাধির আকস্মিক আক্রমণে দেহে মৃত্যু লক্ষণ ফুটে উঠল, ওকে তারা ফেলে দিয়ে চ'লে গেল ভোর রাত্রে।

খুব প্রত্যুষে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন রমনগুপ্ত মহাশয়। চন্দরের বাপ মোহনকে ওইভাবে প'ড়ে থাকতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে কয়েক পা পিছিয়ে এলেন তিনি। দু-দিনের রোগভোগে সবল সমর্থ দেহখানার উপর রোগের শোষণ বা নিষ্পেষণের লক্ষণ বিশেষ ছিল না; গুপ্ত মহাশয়ের মনে হ'ল কেউ বোধ হয় কাউকে হত্যা করেছে। বেদেদের আড্ডা পড়েছিল এখানে। তারা কাল সন্ধ্যাতেও ছিল। রাত্রের অন্ধকারে চ'লে গেছে, সেইখানেই প'ড়ে আছে এমনি একটা দেহ, তাঁর মনে হ'ল তারাই কাউকে খুন ক'রে চ'লে গেছে। এগিয়ে গেলেন তিনি। দেখতে গেলেন—কে? স্থানীয় কেউ কি না? দেখলেন, না, এখানকার কেউ নয়, লোকটা বেদেদেরই একজন। ওদিকে আলো ফুটে উঠে চারিদিক পরিষ্কার হয়ে উঠেছে তখন, দেখতে দেখতে মনে হ'ল লোকটা ত মরে নি। গলার কাছটা খানিকটা যেন নড়ছে। দেহের কোথাও কোন আঘাতের চিহ্নও নাই। বৈদ্যের সন্তান গুপ্ত এবার লোকটার কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখতে দেখতে ব'সে পড়লেন পাশে। আরও কিছুক্ষণ দেখে হাত তুলে নিলেন হাতের মধ্যে।

চন্দরের বাপ বেঁচে উঠল। গুপ্ত বাড়ীতে লোক পাঠিয়ে ওষুধের বাক্স আনিয়ে নাকে কানে অঙ্গের সন্ধিস্থলে ওষুধ দিয়ে কিছুক্ষণ দেখে ওকে বাড়ী এনে তুললেন। ওষুধ দিয়ে সেবা ক'রে বাঁচিয়ে তুললেন।

রোগে আক্রমণটা যেমন আকস্মিক, আরোগ্য লাভ করলও তেমনি শিগ্‌গির। এত দ্রুত না হ'লেও কয়েক দিনের মধ্যেই রোগটা সেরে গেল। কিন্তু রোগের আক্রমণে যা হয়নি, রোগমুক্তির পর তাই হল— শরীরটা কয়েক দিনের মধ্যেই ভেঙে পড়ল। গল্পের কাটা-গাছের মত অবস্থা হ'ল। তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের গল্পে শোনা যায়, গাছটাকে কেটে ছিল এক অস্ত্রবিদ দুর্লভ অস্ত্র দিয়ে। এমনই অস্ত্র যে গাছটা কেটে গেল, কিন্তু পড়ল না। ক্রমে যখন শুকিয়ে গেল, তখন লোকে পরীক্ষা করতে যেতেই গাছটা প'ড়ে গেল আছাড় খেয়ে। রোগে জীর্ণ হয়েছিল দেহের অভ্যন্তর, রোগ ত্যাগের পর সেই জীর্ণতা দেহের বাইরে আত্মপ্রকাশ করলে; শীর্ণ হয়ে গেল সে—কঙ্কালের মত শীর্ণ হয়ে গেল।

গুপ্তের একটা মমতা জন্মে গিয়েছিল। যে রোগীকে চিকিৎসক মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ছিনিয়ে আনেন, সে রোগীর উপর চিকিৎসকের একটা মমতা হয়; বোধ হয় শুভগ্রহের মত বাঁধা প'ড়ে যান চিকিৎসক। গুপ্ত ওকে সযত্নে সারিয়ে তুলতে লাগলেন। সুপথ্য, বলকারক ওষুধ, কোন ব্যবস্থার ত্রুটি করিলেন না। বেদিয়ার দেহ প্রকৃতির সঙ্গে আজীবন যুদ্ধ ক'রে সে দেহের প্রতি কোষে কোষে উর্বর মৃত্তিকার জল-ধারণের শক্তির মত বল ও স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের একটা স্বাভাবিক শক্তি ছিল, তার সঙ্গে ওষুধ ও পথ্যের সাহায্য পেয়ে কিছু দিনের মধ্যেই পূর্বের চেয়েও ভাল স্বাস্থ্যে ভ'রে উঠল তার দেহ, অধিকতর বলে বলীয়ান হয়ে উঠল সে। এবং যাযাবর মানুষটি থেকে গেল এইখানেই। কিছু দিন পর নিজেই কোথা থেকে সংগ্রহ করে আনলে এক সঙ্গিনী। অনাথ ভিক্ষুকের মেয়ে রোগজীর্ণ, তাকে এনে এখানে ঘর বাঁধলে সে। গুপ্ত তাকে চাষের কাজ শিখিয়ে চাষে লাগালেন। সন্তানসন্ততি হ'ল। বৎসর-আষ্টেক

পর আবার এল এক বেদিয়ার দল! সেই দলের তুটি সংসারকে কোন্ মন্ত্রে ভুলিয়ে জানি না, এখানে বাস ক'রে ছোট একটি গোষ্ঠী গ'ড়ে তুললে। বাস্, তার পরই আরম্ভ হ'ল—তাদের রক্তের খেলা, বল-রক্তের খেলা, অভ্যাসের ধর্ম বল তাই। চুরি আরম্ভ হ'ল।

সকলে গুপ্তকে দায়ী করলে। গুপ্তকে মেনে নিতে হ'ল এ অপরাধ। চন্দরের বাপকে ডেকে বললেন, তোর দায়ে কি আমি দেশ ছাড়ব রে?

কেন হুজুর? চন্দরের বাপ হাত জোড় করলে। আট-ন' বছরের মধ্যেই সে খাস বাঙালী হয়ে গিয়েছে।

গুপ্ত বললেন, কেন? তোরা চুরি ক'রে দেশের লোককে উত্যক্ত ক'রে তুললি। আবার 'কেন' বলছিস?

আপনার বাড়ীতে কখনও চুরি হবে না হুজুর, আপনার বংশ যত দিন থাকিবে, আমাদের বংশ যত দিন থাকবে, তত দিন আমাদের কেউ তো করবেই না, অন্য কোন দলকেও চুরি করতে দেবে না।

গুপ্ত হাসবেন কি কাঁদবেন বুঝতে পারলেন না। ওরে হতভাগা, এর পর যে লোক বলবে, সকলের বাড়ী চুরি হয়, ওর বাড়ীতে হয় না যখন, তখন ওই আছে মূলে। আমাকে যে দেশ ছাড়তে হবে রে!

তার পর জেনে-শুনে অনেক ধর্মের কাহিনীর অপব্যয় করলেন। চন্দরের বাপ বললে, আর হবে না বাবু। কান মলছি। তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি।

গুপ্ত পা ছুঁতে দিলেন না। বললেন, থাক্।

গ্রামের লোককে বললেন, দেখুন, অপরাধ আমার। কিন্তু আপনারাও তো বাদ যান নি অপরাধ থেকে। আমি একটা রোগীকে এনে বাড়ীতে রেখেছিলাম। পরে মমতাতে প'ড়ে বাস করবার জায়গা

দিয়েছি। আপনারা তাজা বেদিয়া দেখে বসত করালেন। 'একে উম্নুঘুন্নু দুয়ে পাঠ, তিনে গোলমাল চারে হাট।' ও বেটা একে কিছু করতে পারত না, আর দু-ঘরকে ও আনলে ; আপনারা বসালেন, গোলমাল আপনি বাধল। এখন শুভ চান তো তাড়ান ওদের এখান থেকে। আমি নিজে কিছু করতে পারব না, আশ্রয় দিয়ে তাড়ানো অধর্ম : আপনারা তাড়ান, কিচ্ছু বলব না আমি।

ব'লেও কিন্তু গুপ্তই শেষে বললেন, আচ্ছা, এবারের মত দেখুন।

দেখতে দেখতে একটা পুরুষই কেটে গেপ। এর মধ্যে ওরা বার-কয়েক জেলেও গেল। সেইটাই হ'ল ওদের থাকবার আর এক জোরালো দাবি। জেল থেকে লোকটা না ফিরলে, মেয়েরা যায় কি ক'রে? কোন্ ধর্ম অনুসারেই বা তাড়ানো যায়। জেল-খাটাই হ'ল ওদের ধর্মের জোর, সেই জোরে ওরা থেকে গেল, এবং ম'রে গেল, ম'রে যাবার সময় প্রত্যেকে রেখে গেল দু-তিনটি ছেলে এবং মেয়ে। তিনঘর থেকে হয়ে গেল ন' ঘর ; তাতেও জোর বাড়ল এবং পিতৃপুরুষের ভিটের উপরেও একটা ধর্মের দাবি দাঁড়াল। ওরা থেকে গেল। চুরি বাড়ল। ছড়িয়ে পড়ল। থানার লোকে ধরলে, চালান দিলে, মামলা করলে, কখনও জেল হ'ল, কখনও খালাস পেলে। এখন তাড়াবার কথা উঠলেই ওরাও আইন দেখাতে শুরু করলে।

সেই বংশের মেয়ে এই শিবি।

ওদের মেয়েগুলি পুরুষদের মতই স্বতন্ত্র এবং বিচিত্রচরিত্র। রীতিও বিচিত্র। পুরুষেরা যখন ঘরে থাকে তখন ওরা হিংস্র এবং বন্য, সামান্য কথাতে নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আক্রমণ করে। যখন পুরুষেরা জেলে যায়, মেয়েরা তখন পোষমানা হরিণীর মত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেদের

পিছনে পিছনে বেড়ায়, করুণ মদির দৃষ্টিতে চেয়ে তাদের আকর্ষণ করে।

তিন পুরুষ হয়ে গেছে, বেদেদের বেশভূষা, রীতি ভাষা সব ভুলে গেছে। যে সব অখাদ্য খেত, তার আস্বাদন ভুলে গেছে। কিন্তু এ ধারাটা আজও যায় নি।

শিবি বেদিয়ানী ছিপছিপে পাতলা মেয়ে, মাথায় খাটো, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে গড়নের রেখাগুলি মিহি এবং ধারালো, মাথায় প্রচুর চুল, চোখ দুটো ছোট কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে তার আশ্চর্য আকর্ষণ আছে।

চন্দরের বাপের চার ছেলে, তিন মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে চন্দরই সবচেয়ে ছোট। কিন্তু সে-ই এখন বেদিয়াদের মাতব্বর। চন্দরের মত চতুর, সাহসী, দ্রুতগামী আর কেউ নাই। শিবির মা—চন্দরের ভাগ্নী ছিল রূপসী মেয়ে। চন্দরের হাতের একখানি অস্ত্র। ওই অস্ত্রের সাহায্যে সে বহু উদ্যত বন্ধন ছিন্ন ক'রে নিশ্চিত বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। দারোগা চন্দরের প্রতি গোপনে মমতা করেছেন, বাবুরা অনেক সাহায্য করেছে, বি, এল কেসের সাক্ষী ভেঙেছে। কেসের বিচারক শিবির মাকে দেখে বিশ্বাস করেচেন যে এমন একটি মেয়েকে ধনশালী উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের লোলুপ গ্রাস থেকে রক্ষা করতে গেলে তাদের বিরূপতা স্বাভাবিক এবং পুলিসকে প্রভাবান্বিত ক'রে এমন ষড়যন্ত্রমূলক মামলা করানো এতটুকু আশ্চর্যের বিষয় নয়। বার বার অবশ্য নয়, বার দুয়েক এমন অবিশ্বাস করেছেন বিচারকেরা।

শিবির বাপ কে, সে কথা কেউ জানে না। কিন্তু প্রশ্নও করে না। শিবি বড় হয়ে উঠল, দেখা দিল আপন পরিচয় নিয়ে। মদির দৃষ্টি এবং লীলাচঞ্চল দেহ, কণ্ঠে জলতরঙ্গের মত হাসি, এই তার পরিচয়। বেদিয়ার

ঘরের মেয়ে, তার উপর চন্দরের ভাগ্নী খুকনীর কন্যা—এর চেয়ে আর অধিক পরিচয়ের কি প্রয়োজন? গুপ্তদের পাড়ায় সে যেত। বয়স যখন তার এগারো-বারো, তখন থেকেই তার দেহ দিয়ে খেলা শুরু করেছিল তার মা। সব সে জেনেছিল তখন থেকেই, কি আরও আগে থেকে।

গুপ্ত-পাড়ার চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণ-গান হচ্ছিল সেবার। শিবির মা শিবিকে এবং আরও ক'জন মেয়েকে নিয়ে একটু নিরালা দেখে নিয়মিত যেত গান শুনতে। গান শোনাটা অজুহাত, ওখানে সমাগত ভদ্রলোক-দের নজরে আসাটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য, অন্য দিকে উপার্জনটাও ছিল না প্রধান কারণ, একটা অদ্ভুত নেশায় টানত। ভদ্রলোকদের ছেলেদের ক্ষণিক প্রেয়সী হওয়ার একটা দুর্নিবার নেশা ওদের টানত। নইলে এখন গ্রামে দু-দুটো রাইস-মিল হয়েছে, কুলি-মজুর অনেক, তাদের উপার্জন বাবুদের ছেলেদের বাপ-মায়ের দেওয়া পয়সার চেয়ে অনেক বেশী স্বচ্ছল, তাদের লালসাও অনেক।

ওইখানে প্রথম শিবি দেখেছিল গুপ্ত মহাশয়ের দৌহিত্রকে। বাপ শহরে উকিল, ছেলে প্রভাত সেখানে পড়ে। বয়সে পনেরো-ষোল বছর, গৌরবর্ণ; আয়তনয়ন; ছেলেটি খদ্দরের একটি জামা গায়ে চটি পায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

শিবি দেখালে মাকে আঙুল দিয়ে, দেখছিস মা?

মুচকি হেসে মা বললে, গুপ্ত মহাশয়ের নাতি।

কি সুন্দর চেহারা দেখেছিস?

দেখেছি! দাঁড়া না, দেখছি।

কেউ প্রভাতকে ডেকেছিল এই সময়ে—প্রভাত!

প্রভাত ঘুরে দাঁড়িয়ে উত্তর দিয়েছিল, আজ্ঞে!

শিবি বলেছিল, পেভাত! নামটিও ভারি সোন্দর!

সহরের নোক ওরা। হবে না! ওর বুনের নাম, কি বললে দাঁড়া, বেশ নামটি, মঞ্জু—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মঞ্জুলিকা।

প্রভাত এই সময়ে বাইরে গিয়েছিল কি কাজে। শিবির মা শিবিকে ঠেলা দিয়ে উঠিয়ে দিল। ইশারা ক'রে ব'লে দিলে, যা।

শিবি উঠে চ'লে গেল প্রভাতকে অনুসরণ ক'রে।

প্রভাত দাঁড়িয়েছিল মুক্ত বাতাসে। চণ্ডীমণ্ডপের জনতার মধ্যে গরমে হাঁপিয়ে উঠেছে। শিবি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। প্রভাত লক্ষ্য ক'রে একটু স'রে গেল। ভাবলে, কোন মেয়েছেলে বাইরে এসেছে কোন প্রয়োজনে।

বাবু!

প্রভাত গ্রাহ্য করলে না। অনুমানই করতে পারে নি সে যে, মেয়েটি তাকেই ডাকছে?

বাবু!—এগিয়ে এল শিবি।

কে? কি?

একটা বিড়ি দাও না বাবু।

বিস্ময়ের অবধি রইল না প্রভাতের। বললে, কে তুমি?

আমি শিবি।

শিবি কে।

ওই বেদেপাড়ায় আমার বাড়ি। দাও না বাবু একটা বিড়ি।

বিড়ি? বিড়ি তো আমি খাই না।

ও-মা গ-অ। বেটাছেলে—জোয়ান ছেলে বিড়ি খাও না?

প্রভাত এবার হতভম্ভ হয়ে গেল। শহরে থাকে; সত্যকারের ভাল ছেলে,—ক্লাসে ফার্স্ট হয়, সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে যায় না। এমনি ভাবে নির্জন রাতে একটা মেয়ে এইভাবে কথা বলতে পারে—এ তার কল্পনার বাইরে না-হ'লেও মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সহ্য করতে পারলে না। তার ভয় হ'ল, শরীর কেমন কেঁপে উঠল! কোনও কথা সে বলতে পারলে না।

মেয়েটা আরও একটু এগিয়ে এসে বললে, পয়সা দাও না বাবু, বিড়ি কিনে আনি। চল, ওই ঘাটে ব'সে খেয়ে দেখবে।

প্রভাত এবার প্রায় ছুটে চ'লে গেল চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর। শিবি এটা কল্পনা করতে পারে নি। পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা এর চেয়ে অনেক চালাক, অনেক শক্ত। আর সে দাঁড়াল না, স'রে চ'লে গেল অন্ধকারের মধ্যে খানিকটা দূরেই হারু সেনের ভাঙা গোয়াল-ঘরের দিকে—দ্রুতই চ'লে গেল। পাশ দিয়ে কি একটা সরসর ক'রে চ'লে গেল ঝোপের মধ্যে। শিবি বললে, মরণ! মরতে আর জায়গা পাস না তোরা।

একটু পরেই শিবি দেখলে, দুজন বেরিয়ে এল। হাতে আলো! এক জন প্রভাত, অন্য জন প্রভাতের মামা।

কই—কোথায়?

এইখানে ছিল।

এর জন্যে তুই কাঁদছিস কেন? তোর দোষটা কোথায়? দেখ্‌না কি সাজা দিই ওকে!

শিবি অবাক হয়ে গেল। ও মা! কি ধারার পুরুষ গো? এই কথায় কাঁদে? ছি-ছি-ছি। শিবির লজ্জা হ'ল। একটা দীর্ঘনিশ্বাসও ফেললে, দুঃখ হ'ল তার। কেন হ'ল খতিয়ে দেখলে না। কিন্তু মনটা

কেমন তেতো হয়ে গেল। সে ভাঙা ঘরের পাশ দিয়ে গিয়ে একটা পুকুরের ভিতর নেমে পড়ল, জলের ধারে ধারে পাড়ের আড়াল রেখে নিঃশব্দে চ'লে গেল নিজেদের পাড়া। চন্দরকে বললে, ওরা খোঁজ করতে আসবে লাগছে কত্তাদাদা।

চন্দর বললে, আসবে আসবে। বলবি, বাবুই আমাকে ইশারা ক'রে ডেকেছিল।

না কত্তাদাদা, ছেলেটা কেঁদে ভাসিয়ে দেবে। নয় গলায় দড়ি-ফড়ি দেবে। আমি তোমার মাচানে উঠে ব'সে রইলাম। এলে ব'লো সে তো সকাল থেকে ঘরে নাই। কুটুম-বাড়ী গিয়েছে!

চন্দর বললে, ওঃ! তোর যে দেখি একেবারে অথই দরদ!

খোঁজ হ'ল। চন্দর তিরস্কার শুনলে। শিবির মাও শুনলে। তারা কিন্তু বাদ-প্রতিবাদ করলে না,। বললে, এই পায়ে হাত দিয়ে বলছি, শিবি সেই কাল সোমবার থেকে ঘরে নাই। কুটুম-বাড়ী গিয়েছে।

তার অনেক দিন পর। বোধ হয় সাত-আট বছর পর। শিবি তখন ভোলার সঙ্গে সাঙা করেছে। ভোলা দাগী চোর। জেলখানায় আলাপ চন্দরের সঙ্গে। চন্দরের ছেলে হাবলার প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠেছিল। তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স। মুখে বসন্তের দাগ, কিন্তু দুর্দান্ত জোয়ান, আর তেমনি নিষ্ঠুর ও উচ্ছৃঙ্খল। জেল থেকে বেরিয়ে সে

একদিন এল এই বেদিয়া পাড়ার হাবলের কাছে। শিবির সঙ্গে আলাপ হ'ল। মদ খাওয়ালে সে, গল্প করলে ডাকাতির। ভোলা চোর নয়, ভোলা ডাকাত। সাহসের কথায় সে বললে, সে কোন কিছুকে ভয় করে না। ভূত-প্রেত দানা-দত্যি পুলিস দারোগা বাবু-মহাজন রাজা-মহারাজা কাউকে না।

পুলিশ দারোগা বাবু মহাজন রাজা মহারাজা—এ নিয়ে কোন তর্ক উঠল না। উঠল ভূত নিয়ে। মহাবল বললে, কত বড় মরদ, কই যাও গিয়ে আমাদের লালুকচাঁদা পুকুরের পাড়ের বটগাছের 'শিবডগালে' বেঁধে রেখে এস দেখি একখানা লাল ন্যাকড়া। দেখি কেমন মরদ।

চন্দর বললে, এই দেখ, ও সব তর্কে কাজ কি রে বাবা? ও সব ছাড়ান দে।

ভোলা কানেই তুললে না, বললে, বাজি রইল পাঁচ টাকা নগদ—খাসির দাম আর পাকি মদ দেবে তোমরা বল?

শিবি ব'লে উঠল, আমি দোবো। এই রইল আমার কানের ফুল, হাতের অঙুটি। কাল—কাল তা হ'লে যাবে। ঠিক রাত দুপুরে। দিনে দেখে আসবে গাছ।

গাছ আমি দেখেছি। আজই এখন উঠছি আমি! দাও লাল গামছা।

হাবল বললে, যাক্ ভাই বন্ধু। ওসব বাঁজা তক্কে কাজ কি! আমি হার মানছি।

চন্দরও বললে, ভোলানাথ, বুড়ো মানুষের কথা শুনতে হয়।

ভোলা ছাড়লে না। সে বললে, দাও মদ দু পাত্য—দাও।

শিবি হঠাৎ মায়ের কাছে উঠে গেল।

ভোলা মন্ত্র পান ক'রে উঠে বললে, চললাম তা হ'লে। কই হে, কোথায় গেলে? চারিদিক তাকিয়ে সে শিবিকে খুঁজলে।

শিবির মা বললে, শুল। বলছে—গা ঘুরছে।

ভোলা চ'লে গেল গ্রাম পার হ'য়ে। নির্জন প্রান্তরে একটা জলহীন পুকুর, চারিদিকে বাঁশ কয়লা ছেঁড়া কাঁথা বালিশ ছড়ানো, তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে এক প্রাচীন বট, শাখার পল্লব এমন ঘন যে দিনেও তলায় জ'মে থাকে ছায়ার চেয়েও গাঢ় কিছু,—অন্ধকারই তাকে বলতে হয়। রাত্রে ভীমকায় গাছটাকে দূর থেকে দেখে মনে হয়, আকাশের গায়ে ঘন কালো কালবৈশাখীর মেঘের একটা পুঞ্জ থম্‌কে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ভোলা এগিয়ে এল। থম্‌কে দাঁড়ালো। বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। গাছটার একটা ডাল দুলছে। ডালটার উপর একটা শাদা মূর্তি। একটা ডালে পা রেখে উপরের ডালটা ধ'রে নাড়ছে।

ভোলা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হা হা ক'রে হেসে উঠে গাছের ডালটা ধ'রে দোল খেয়ে উঠে প'ড়ে পাকড়াও করলে শিবিকে।

সেই গাছের ডালে ব'সেই ওদের প্রথম প্রণয়ালাপ হ'ল, ঘনিষ্ঠ হ'ল পরস্পর।

পরের দিন ভোলা জাত দিয়ে হ'ল বাদিয়া! বিয়ে করল শিবিকে।

ভোলা যখন ঘরে থাকে, শিবি তখন ব্যাঘ্রী। যখন সে জেলে যায়, তখন সে স্বৈরিণী। কিন্তু ভোলা তখন জেলের বাইরে—ঘরেই ছিল। ওদের বিয়ের সাত বছর পরের কথা।

গাঁয়ে তখন বড় স্টেশন হয়েছে। ভোলা ঘর বেঁধেছে স্টেশনের

পথের ধারে। শিবি উঠানে ব'সে পশ্চিমের রৌদ্রে চুল এলো ক'রে দিয়ে শুকচ্ছিল; প্রভাতের সঙ্গে আবার শিবির দেখা হ'ল।

প্রভাত স্টেশনে নেমে ব্যাগটা কুলির মাথায় দিয়ে যাচ্ছিল মামার বাড়ী।

শিবি উঠে দাঁড়াল উঠানে।

গৌরবর্ণ লম্বা তরুণ জোয়ান, চোখে চশমা, পরনে ধপধপে খদ্দরের পাঞ্জাবি, খদ্দরের কাপড়, পায়ে কাব্‌লী স্যাণ্ডেল। এমন সুন্দর চেহারার বাবু তো এ গাঁয়ে নাই! কে? চেনা-চেনাও মনে হচ্ছে যেন! স্থির দৃষ্টি রেখে সে পথের উপর দাঁড়াল।

চিনতে পারলে। ঠিক চিনলে। বুকের ভেতরটা কেমন ক'রে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাবেন গো বাবু?

প্রভাত ভ্রূ-কুঞ্চিত করে ওর দিকে তাকাল। পথের ধারে একটা মেয়ে এমন ক'রে 'কোথায় যাবে' জিজ্ঞাসা করে, এটা তার কাছে ভাল লাগল না। ঘাড় বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্যপূর্ণ বঙ্কিম দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আপাদমস্তক দেখে ঘুরে দাঁড়াল সোজা হয়ে। মুহূর্তে তার মনে প'ড়ে গেল সাত বছর আগের একটি প্রগল্‌ভা মেয়ের কথা। চিনে ফেললে প্রভাত। এ তো সেই বেদের মেয়ে। বয়সের গুণে খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। রূপটা উজ্জ্বল হয়েছে, মদির হয়েছে, মাথায় খানিকটা লম্বা হয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করলে, হুঁ। তুই তো বেদেদের সেই মেয়েটা?

শিবি হেসে বললে, "হ্যাঁ গো সেই মেয়েটা। চিনেছেন তা হ'লে। দাঁড়ান, পেণাম করি।

না। স'রে দাঁড়াল প্রভাত। ঘৃণাভরেই বললে, এখনও সেই রকম আছিস তুই?

চ'লে গেল সে।

শিবির চোখে আজ ছেলেবেলার নেশা নাই। আজ সে তীক্ষ্ণ-বাস্তব বুদ্ধিমতী ছলনাময়ী। সে আজকাল বাবুপাড়া দিয়ে হাঁটেই না। হাঁটে সে বাজারের পথে, স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে, স্টলে, হাঁটে সে রাইস-মিলের কাছাকাছি। বাবুদের ছেলেদের নামে ঘেন্না জ'ন্মে গেছে। ওরা জানে শুধু ব্যাভিচার করতে, ভালবাসা ওদের নাই, ভোলার মত জাত দিতে ওরা পারে না। নিতান্ত অভাবে দেহের কারবার ক'রে খেতে হয়, প্রয়োজন অর্থের। সে অর্থ বাবুরা রাইস-মিলের কুলিদের মত কি বাজারে দোকানীদের ছোকরাদের মত দিতে পারে না। তখন ওদের দিকে তাকাবে কেন? ওরা বড় সাধু সাজে। আজ রাত্রে তোমার সঙ্গে খেলা খেলে কাল তোমায় দেখেও ব'সে থাকবে গম্ভীর হয়ে, যদি তোমার বুকের ভিতরের হাসির মধু উপচে এসে ঠোঁটে ছড়িয়ে পড়ে তবে সে হাসির মধুকে মদ ব'লে ঘেন্না ক'রে শাসন ক'রে বলবে, নচ্ছার, এখানে এসেছে মদ বেচতে, এই ঠাকুর-বাড়ির উঠানে! তাই শিবির ঘেন্না জন্মেছে, তাই শিবি ওদের নামে থুতু ফেলে। কি ক'রে জানবি তোরা শিবির কথা; বেদের মেয়ের কথা। তোদের বাইরের খোসাটা দিয়ে খেলা করে, তার বুকের ভিতরের মানুষ বুকের ভিতরে আছে, থাকে। এই কথা তাদের বুকের মানুষও জানে। যেটা একদিন পুড়ে যাবে, প'চে যাবে, প'ড়ে থাকবে, সে জিনিসের আবার 'ছুঁত-পবিত'! তাই তারাও এতে আপত্তি করে না।

আজ কিন্তু শিবি পথের উপর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ।

মা ডাকলে, দাঁড়িয়ে কেন লো?

শিবি ফিরে এসে বললে, মা, সেই পেভাতবাবু এসেছে, সেই গুপ্ত-বাড়ির মেয়ের ছাওয়াল ! সেই যে গো—কেঁদে ফেলেছিল !

মা বললে, মরণ ! এখনও নেশা আছে না কি ?

লজ্জা পেলে শিবি। বললে, না। তারপর খিলখিল ক'রে হেসে বললে, এখন খুব জোয়ান হয়েছে গো ! আমি কথা বললাম, তা এবার আর কাঁদলে না।

কাচের ঢাকার মধ্যে দুর্লভ ফুল ঢেকে রাখে। তার চারিপাশে ঘুরে বেড়ায় নীল মাছি।

তেমনি ভাবে শিবি এবার ঘুরতে লাগল গুপ্তপাড়ায়।

চকিত হয়ে উঠল লোকে। নীল মাছি—নর্দমায় উৎপত্তি, সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখলে লোকে সাবধান হয়, চকিত হয়।

লোকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ভ্রূ-কুঞ্চিত করলে। গ্রাহ্য করলে না শিবি। তারপরও ঘুরতে দেখে ওকে লোকে সাবধান করে দিলে—এ পাড়ায় কেন ?

আমার খুশি। পাড়ার পথে ঘুরি, কারুর ঘরে ঢুকি না, সরকারি পথ, ইউনান বোর্ডের ট্যাক্স দি; একশো বার হাঁটব।

প্রভাত যে ঘরে থাকে, তার পিছনে পুরানো বাগান। সেই বাগানে গিয়ে ব'সে গান গাইতে শুরু করলে। প্রভাত জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলে।

মুখে পিচ কেটে উঠে চ'লে এল শিবি। বললে, মরণ আমার !

প্রভাত আবার একদিন চ'লে গেল। শিবি ওপাড়ায় হাঁটা ছেড়ে দিলে।

আরও বছর কয়েক পর।

ভোলা এবার জেলে গিয়েছে। ডাকাতির মামলায় মেয়াদ হয়েছে পাঁচ বছর। স্বৈরিণী শিবির বয়স বেড়েছে, কিন্তু বেদের মেয়ের মুখে তার ছাপ পড়ে নি। ঠিক যেন সেই শিবিই আছে, শুধু পাতলা দেহখানা ঈষৎ ভারী হয়েছে। শিবি জানে তাতে তার আকর্ষণ বেড়েছে। সাজ-সজ্জার ঢঙও পালটেছে সে। বুকের মানুষকে বুকে রেখে—দেহ নিয়ে সে বেসাতি করে।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ এল গোঁসাইজী। লিক্‌লিকে পাতলা গোঁসাইজী শিবির চেয়েও ভ্রষ্ট চরিত্র। পুলিসের গুপ্তচর। সাবধান হ'ল শিবি।

গোঁসাই বললে, ডাকবাংলায় চল্।

কেন গো? সেখানে কেন? মরণ-আমার!

ইনস্‌পেক্টর এসেছে। টাকা দেবে।

শিবির আপত্তি নাই। ডাকাতের পরিবার সে, কিন্তু পুলিসের হোমরা-চোমরা এসে তাকে নিয়ে আমোদ করে। সচরাচর করে না। খবর দিয়ে এলে তখন অন্য বন্দোবস্ত হয়ে থাকে। গরীব সৎজাতের খারাপ-চরিত্রের মেয়েদের আনে। তার জন্য লোক আছে। হঠাৎ এসে পড়লেই তাকে ডাক পড়ে। আসে গোঁসাইজী। শিবি হাত পেতে বললে, টাকা আগাম দাও।

ছুটো টাকা। আগে ছিল এক টাকা। যুদ্ধের বাজারে এক টাকা ছু'টাকা হয়েছে। টাকা ঘরে রেখে কাপড় পালটে শিবি বললে, চল।

গোঁসাই রসিকতা ক'রে বললে, হেঁটে নয়, চল মটর এনেছি।

শিবি বললে, মটরের চেয়ে তোমার কাঁধ ভাল। চল না কাঁধে ক'রে নিয়ে।

শিবি ফিরল গভীর রাত্রে।

মোটর থেকে নেমে ঘরে ঢুকল।

মা বললে, এলি!

হুঁ।

শুয়ে পড়।

হুঁ।

হুঁ কি? শুয়ে পড়্।

শিবি দরজায় কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মা উঠে বলল, শিবি!

চুপ। তারপর দরজা খুলে দাওয়ায় বেরিয়ে দাঁড়াল! কিছুক্ষণ চারিদিকে একখানা কালো কাপড় টেনে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে বললে, আসছি। চুপ ক'রে শুয়ে থাক্।

শিবির মা—চন্দন বেদের ভাগ্নি এর পর আর প্রশ্ন করলে না।

শিবি আপথ ভেঙে, জঙ্গলে জঙ্গলে এসে উঠল গুপ্ত-বাড়ির পিছনের বাগানে।

ছোট ঢেলা নিয়ে জানালায় মারতে লাগল, টুক্-টুক্-টুক্-টুক্।

অল্প একটু খুলল জানালাটা।

শিবি বললে, পেভাতবাবু হও তো শোন। তোমার খোঁজে পুলিস এসেছে। তুমি নাকি ফেরার, শেষ-রাত্রে পাড়া ঘেরাও করবে মটর-বোঝাই পুলিস এসেছে বন্দুক নিয়ে আমি দেখে এসেছি। রাত তিনটে বাজবে আর পুলিস ব'সে যাবে চারিদিকে।

জানালটা খুলে গেল। প্রভাত বললে, কে তুমি?

আমি বেদের মেয়ে, শিবি বাদিয়ানি।

জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল। শিবি দাঁড়িয়ে রইল। মিনিট কয়েক

পরেই বেরিয়ে এল প্রভাত। কাঁধে তার একটা বড় ঝোলা। অন্ধকারে ভাল দেখতে পেল না শিবি, তবু মনে হ'ল, প্রভাতবাবু আরও যেন ধারাল হয়েছে ইস্পাতের ছোরার মত, অন্ধকারের মধ্যেও পালিশ যেন চক্‌চক্‌ করছে।

শিবির হাতখানা চেপে ধরলে প্রভাত। একসঙ্গে চমকে এবং শিউরে উঠল শিবি। পর-মুহূর্তেই ভুল ভাঙ্গল। হাতের মুঠি প্রভাতবাবুর যেন লোহার সাঁড়াশী। চাপা গলায় সাপের মত গর্জন ক'রে প্রভাত বললে, কি ক'রে জানলি তুই ?

জানলাম বাবু, আমায় ডেকেছিল ডাক-বাংলায়।

ডাক-বাংলায় ? কে ? কেন ?

বেদের মেয়েকে ডাক-বাংলায়, থানায় ডাকে বাবু। সরকারী বাবুরা দু-চার জন ডাকে। তারা তোমার মত গঙ্গাজল খায় না বাবু। আমি মিছে বলি নাই। তুমি পালাও।

মিথ্যে বলে নাই, সে প্রভাত জানে।

হনহন ক'রে এগিয়ে চলল সে। কিছু দূর গিয়েই তাকে দাঁড়াতে হ'ল। মোটর লরির গর্জন উঠে গেছে গ্রামের পথে। শিবি বললে, আমার সঙ্গে এসে।

তোর সঙ্গে ?

হ্যাঁ। এস।

উপায় নাই। শিবির পিছনেই চলল প্রভাত।

লরির গর্জন এগিয়ে এল। থামল। একটা বাঁশী বাজাল, হুইসিল।

শিবি বললে, আমার ঘরে ঢোক !

থমকে দাঁড়াল প্রভাত।

স্তব্ধ পল্লীপথ অনেকগুলো ভারী জুতো একসঙ্গে পড়ছে, তার শব্দ উঠছে ভৌতিক শব্দের মত। ধূলোয় ভরা গ্রামের পথ। মস্-মস্-মস্-মস্।

শিবির মা বেরিয়ে দাওয়ায় শুল।

মস্-মস্-মস্-মস্। শব্দ উঠছে। এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছে এদিক থেকে হুইসিল বাজছে' ওদিক থেকে সাড়া আসছে হুইসিলেরই।

মা মৃদুস্বরে বাইরে থেকে কাশলে!

শিবি বললে, চুপ ক'রে বিছানায় শুয়ে পড়।

বিছানায়?

হ্যাঁ।

জুতোর শব্দ দূরে চ'লে গেল।

শিবি হেসে বললে, ওরা যদি আসে? যদি দেখে থাকে? তুমি শুয়ে পড়, ভেল্কী লাগিয়ে তোমাকে উড়িয়ে দি। ওরা দেখতে পাবে না, খুঁজে পাবে না।

সর্বনাশী বেদের মেয়ের এসময়েও হাসি, এ সময়েও বিচিত্র রসিকতা! অতি মৃদুস্বরে সে গান ধ'রে দিলে—

বাবু তোমায় দেখাই দেখো;
কাঁউরের ভেল্কী বাজী,
বেদের মেয়ের ভেল্কী খেলা—
তোমারে দেখাই দেখো;
তুমি শুধু চেয়ে থাকো
বেদের মেয়ের মুখের দিকে—

চোখে চোখ মিলিয়ে রেখে

তুমি শুধু চেয়ে থাকো

দেখাই দেখো!

নিজে তুমি সামনে থেকো

তোমায় হারিয়ে দোব, উড়িয়ে দোব

আকাশে উড়িয়ে দোব—

নিজেকে সামাল রেখো—

চেয়ে থাকো

প্রভাত সত্যই যেন নেশায় অভিভুত হয়ে পড়েছিল।

শিবি অতি ক্ষীণ হিল্লোলে দেহ লীলায়িত ক'রে নাচছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেহখানি শুধু এঁকেবেঁকে দুলছে!

শিবি সর্বনাশী! প্রভাতের শিয়রে সর্বনাশ! আর সে গান গাইছে—

এবারে কাজল পরো—

আমার চোখের কাজল নিয়ে

তোমার চোখে কাজল দিয়ে

তাকিয়ে দেখ দেখি, ফুটল নাকি—

দেখ তো ফুটল নাকি

আকাশের তারাগুলান

দুই আকাশের তারাগুলান

ফুল হয়ে ফুটল নাকি—

দেখ দেখি!

সংযত ক'রে ফেললে প্রভাত নিজেকে! অগ্রসর হ'ল সে দরজার দিকে।

বাবু!

না।

বেরিয়ো না বাবু।

না।

না। এখানেও ধরবে—বাইরে ও ধরতে পারবে না। তুমি শুয়ে পড়, আমি তোমাকে ঢেকে শুয়ে পড়ব, নেপ ঢাকা দোব। মাথার চুল ফেলে দোব বালিশের ওপর মা বলবে, ডাক-বাংলা থেকে ফিরে আমার কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে।

প্রভাতের সমস্ত শরীর যেন ঘৃণায় শিউরে সঙ্কুচিত হয়ে গেল। সে মুহূর্তে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল।

বাবু! বাবু!—ছুটে বাইরে এল শিবি। দেখলে, প্রভাত মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

কয়েক মিনিট পরেই গুলির শব্দ উঠিল। ফট্-ফট্।

গোলমাল উঠল প্রচণ্ড।

তার কয়েক মিনিট পরেই আহত প্রভাতকে ব'য়ে নিয়ে রাস্তা দিয়ে চ'লে গেল পুলিসের সেপাইয়ের দল। ১৯৪২ সাল।

তারও কয়েক বছর পর।

প্রভাতের গুলি লেগেছিল পায়ে। জানুর মাংস ভেদ ক'রে চ'লে গিয়েছিল। সেরে ওঠার পর হয়েছিল জেল। এবার শ্রাবণ মাসে নাকি দেশ থেকে সায়েবদের রাজত্ব গেল। রাজত্ব নাকি এখন স্বদেশী-বাবুদের। শিবি মধ্যে মধ্যে ভাবে, প্রভাতবাবু তবে কোথায়? তাকে রাজবেশে দেখতে তার সাধ হয়।

ভোলা জেল থেকে খালাস পেয়েছে। ওই জন্যেই পেয়েছে নইলে মেয়াদের আরও বছরখানেক বাকি ছিল।

আজ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল শিবির প্রভাতবাবুর সঙ্গে। এমন ভাবে' দেখা হবে, তা কে জানত! হাজতের মধ্যে অন্ধকার। বাইরে অমাবস্যা কালীপূজোর দিন। শিবি একা হাজতের কোণে বসে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

টকটকে রক্ত তার সর্বাঙ্গে এখনও লেগে রয়েছে।

ফিন্‌কি দিয়ে প্রভাতের রক্ত তার মুখে এসে লেগেছিল।

কালীপূজোর রাত্রে ভোলা ডাকাতি করতে গিয়েছিল। এই গাঁয়েই। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে হয়েছে নতুন হাসপাতাল। হাসপাতাল' আর ডাক্তারের বাসা ছাড়া কাছে-পিঠে বাড়ী ঘর নাই। সে দিন ভোলানিজে কানে শুনে এসেছিল কালীপূজোর রাত্রে ডাক্তার যাবে মহেশপুরে দশ হাত উঁচু কালীর পূজো দেখতে। সেখানকার বাবুরা নিমন্ত্রণ করে গিয়েছে। তারাই পাঠাবে গাড়ি। ডাক্তারের বাড়িতে থাকবে শুধু একটা চাকর। ডাক্তার প্রচুর রোজগার করে। ডাক্তারের বাড়ির মেয়েছেলের গায়ে অনেক গয়না। ভোলা এ সুযোগ ছাড়লে না। শিবি খুশি হ'ল। ডাক্তারের বউয়ের গলার হারটা সে গলায় পরবে। ওটা সে রাখবে। দিনে পরা চলবে না রাত্রে প'রে শুয়ে থাকবে। আলো জেলে আয়নায় দেখবে, তাকে কেমন মানায়!

মহেশপুরে যাবার পথ, এই স্টেশনের পথ। বাবুদের গাড়ি এল। চ'লে গেল হাসপাতালের দিকে, আবার ঘুরে চ'লে গেল মহেশপুরের দিকে। ভোলারা বেরিয়ে পড়ল। শিবি দাঁড়িয়ে রইল বাড়ির সামনের গাছতলার নীচে! মাথার উপরে গাছটার কোন কোটরে সাপে বোধ

হয় পাখির বাচ্চা ধরেছে। চেঁচাচ্ছে বাচ্চাটা, কাতরে কাতরে চেঁচাচ্ছে। পাখির মা-টা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, পাখা ঝাপটাচ্ছে।

হঠাৎ উঠল বন্দুকের শব্দ।

চমকে উঠল শিবি। বন্দুক! একটা' দুটো—আবার—। এবার একটা দুটো তিনটে পাঁচটা—! মা ডাকলে, শিবি!

হ্যাঁ।

কি হ'ল, বল দেখি?

বুঝতে পারছি না।

ওর বুক ধড়ফড় করছে, কিন্তু চোখ ধকধক্ ক'রে জ্বলছে।

বাড়ী আয়।

না।—এগিয়ে চলল সে।

ছুটে কেউ আসছে!—কে? ভোলা

হাঁপাতে হাঁপাতে ভোলা বললে, আমি।

কি হ'ল?

বন্দুক। গুলি চালালে। কে একজন ডাক্তারের বাসায় এসেছে। জানতাম না। ডাক্তার যায় নাই। সেই লোকটা ডাক্তারের বন্দুক দিয়ে দাঁড়িয়ে গুলি চালালে। চল্, বাড়ী চল্। পায়ে ছিটে লেগেছে। বেশি লাগে নাই, রক্ত ঝরছে খানিক খানিক!

তু পালা। বলব—বাড়ি নাই, কুটুম-বাড়ি গিয়েছিস।

জল। জল খাব এক ঘটি। সর্বশরীর কাঁপছে।

জল খেতে ঘরে ঢুকেছে। উঠানে ছটা বেজে উঠল জোরালো টর্চের শিবি দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

উঠানে অনেকগুলো জুতোর শব্দ।

ভোলা কই ?

সে তো বাড়ি নেই বাবা।

কোথায় ?

কুটুম-বাড়ি গিয়েছে সকালে।

দরজা খোল। ঘর দেখব।

ঘরে শিবি শুয়ে আছে বাবা। তার হেলে কেঁপে জ্বর এসেছে তিনখানা কাঁথা দিয়ে কাঁপন থামে না।

খোল্ না তুই দরজা।

ভেতর থেকে বন্ধ আছে। শিবির জ্বর কে খুলবে ?

প্রচণ্ড লাথি পড়ল দরজায়। একটা দুটো তিনটে। খিলটা ছেড়ে গেল ।

ঘরখানা টর্চের আলোয় ভ'রে উঠল। মেঝের উপর বাদিয়াদের বিছানায় কাঁথা চাপিয়ে উপুড় হয়ে প'ড়ে আছে একটা মেয়ে। বালিশের উপরে চুলের রাশ এলিয়ে মেঝের উপর প'ড়ে ধুলোয় লুটোচ্ছে। নিথর, বোধ: হয় চেতনা নাই। দারোগা টর্চটা, দুবার তিনবার ফেললেন।

ওইখানেই আছে দারোগাবাবু।

কোথায় ? ও তো সেই মেয়েটা। ওই মাগীর সেই মেয়েটা, জ্বর হয়েছে।

না। আমি জানি।

চমকে উঠল শিবি। বিছানার ভিতর থাকে একটা ছুরি। সে চেপে ধরলে।

কাঁথাটা টেনে ফেলে দিচ্ছে।

ভোলা, আমি মারব ছুরি। তুই পালাবি।

ডালা-খোলা ঝাঁপির ভিতরের সাপের ফণা তুলে ছোবল মারার মত শিবি লাফিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ছোবল মারার মত ছুরিখানা বসিয়ে দিলে।

দারোগা হা-হা ক'রে ছুটে এল।

ভোলা ছুটে পালাল খোলা দরজা দিয়ে।

নিষ্ঠুর মুঠোতে চেপে ধরেছে শিবির হাত। ঝনঝন করছে, খ'সে যাচ্ছে।

প্রভাতবাবু!

হ্যাঁ।

খুব লেগেছে? কোথায় লেগেছে?

আর শুনতে পায় নি শিবি। সে যেন কালা হয়ে গেল। আলোময় হয়ে উঠেছে ঘরটা। প্রভাতবাবুই তো!

এলিয়ে পড়ে গেল সে। ছুরি যেন সে নিজের বুকেই মেরেছে।

হাজতে ব'সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে।

ঠোঁটের উপর এখনও লেগে রয়েছে প্রভাতবাবুর রক্ত!

রক্ত লোনা। চোখের জল তাও লোনা।

নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান

সকল আলো যেন অকস্মাৎ এক মুহূর্তে নিবে গেল। আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত যেন নিরন্ধ্র অন্ধকারে ঢেকে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল সকল শব্দ, শুধু অব্যক্ত বেদনায় একটা মর্মভেদী কম্পন ব'য়ে গেল বায়ুস্তরে; পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত কম্পিত বায়ুস্তর সংবাদ ছড়িয়ে দিলে—মহাত্মা গান্ধী হত হয়েছেন। পিস্তলের গুলিতে আহত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মহাত্মাজী আর নাই।

৩০শে জানুয়ারী, সন্ধ্যার প্রাক্কাল। অল-ইণ্ডিয়া-রেডিও থেকে কয়েক মুহূর্তের আকস্মিক স্তব্ধতার পর গভীর শোকার্ত অথচ সংযত কণ্ঠে ঘোষণা ধ্বনিত হয়ে উঠল—মহাত্মাজী আর নাই।

মুহূর্তে আমার মনে হ'ল, সকল আলো যেন অকস্মাৎ এক মুহূর্তে নিবে গেছে। আর কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। মনে হ'ল সকল শব্দ যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। আর মনে হ'ল বায়ুস্তরে, একটা কম্পনের স্পর্শ পাচ্ছি। বায়ুস্তর যেন কাঁপছে।

দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করে চলেছিলাম। চারিপাশে স্তম্ভিত জনতা সিনেমা হল থেকে দর্শকেরা বেরিয়ে আসছে, দোকান বন্ধ হচ্ছে, মধ্যে মধ্যে রেডিও থেকে দু-এক মিনিট স্তব্ধতার পর নিয়মিতভাবে প্রচারিত হচ্ছে—মহাত্মা গান্ধী পিস্তলের গুলিতে আহত হয়ে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

মধ্যে মধ্যে জনতার মধ্য থেকে ক্রুদ্ধ প্রশ্ন ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—কে? কে সে?

আমার মনেও ধ্বনিত হয়ে উঠল ক্রুদ্ধ প্রশ্নের প্রতিধ্বনি—কে? কে? কে সে হত্যাকারী? ক্রুদ্ধ গর্জনে চীৎকার করতে ইচ্ছা হ'ল, কে হত্যাকারী? কি তার নাম, কি তার পরিচয়, কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত সে?

আবার যেন সমগ্র বায়ুমণ্ডলে একটা কম্পনের স্পর্শ অনুভব করলাম, উত্তপ্ত বায়ুমণ্ডলে যেন থরথর ক'রে কম্পন ব'য়ে যাচ্ছে; ক্রুদ্ধ ভারতবর্ষের মানুষের মনের স্পর্শে বায়ুমণ্ডলে বহ্নিজ্বালা সঞ্চারিত হয়েছে, একটিমাত্র প্রশ্নের আঘাতে থরথর ক'রে কাঁপছে—কে সে হত্যাকারী? কি তার নাম? কোন সম্প্রদায়ভুক্ত সে?

বাড়ীর দোরে খবরের কাগজের আপিস। বিপুল জনতা জ'মে আছে সেখানে। স্পেশাল বের হবে। হকারেরা ঝুঁকে পড়েছে কোলাপ্-সিব্ল গেটের উপর। গেট বন্ধ। ভিতরে দ্রুতগতিতে চলেছে রোটারি যন্ত্র। জনতার মধ্য দিয়ে কোন রকমে পথ ক'রে বাড়ি এসে পৌছুলাম। পিছনে জনতার কোলাহল ধ্বনিত হচ্ছে। সিঁড়িতে উঠতেই অন্য একটি বিপরীত সুর কানে এসে পৌছাল। দেওয়ালের আবরণের মধ্যে বাড়িখানা স্তব্ধ, সেই স্তব্ধ পরিবেশনের মধ্যে সকরুণ বৈরাগ্যে মর্মস্পর্শী সুরে গান বাজছে, 'সম্মুখে শান্তি পারাবার ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।" অন্ধকার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গেলাম। গভীর দীর্ঘনিশ্বাস আপনি ঝরে পড়ল বুক থেকে, চোখ থেকে গড়িয়ে এল তপ্ত অশ্রুর ধারা।

শান্তি

বাড়ীর ছেলেমেয়েরা স্তব্ধ বিষণ্ণ। কণ্ঠ হয়ে গেছে মুক, মন হয়ে গেছে বিহ্বল, মস্তিষ্ক অভিভূত। পরস্পরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে ব'সে আছে।

তাদের মধ্যেও ব'সে থাকতে পারলাম না। তেতলার ছাদের উপর ছোট কুঠুরিটিতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে আলো নিবিয়ে দিলাম। ইচ্ছা হ'ল, চীৎকার ক'রে কাঁদি। চীৎকার ক'রে কেঁদে ডাকি—ডাকি মহাত্মাজীর আত্মাকে; জীবনের শেষমুহূর্তটি পর্যন্ত কর্মের পতাকা, ধর্মের পতাকা বহন ক'রে আততায়ীর আক্রমণকে বুকে নিয়ে সকল কর্ম শেষ ক'রে যে আত্মা চলেছে অমৃতলোকের উদ্দেশ্যে, সেই আত্মাকে ডাকি—ফিরে এস হে পিতা, হে মহাত্মা, হে শান্ত, হে শুভ্র, হে অনন্তপুণ্যের প্রতীক, তুমি জিতেন্দ্রিয়, তুমি জিতনিদ্র, জিতাহার, তুমি অপরাজিতা মন্ত্রের তপস্বী, তোমার পরাজয় নাই, তোমার মৃত্যু নাই, তুমি তো জিতমৃত্যু, হতে পারে না তোমার মৃত্যু, তুমি ফিরে এস—তুমি ফিরে এস—তুমি ফিরে এস।

কিন্তু কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে। চীৎকার করতে পারলাম না। টেবিলের উপর মাথা রেখে বসে রইলাম।

রেডিওতে করুণ সুরে বেহালা বাজছে। আমার অন্তরে যেন তার প্রতিধ্বনি উঠেছে। শুধু আমার অন্তরেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের অন্তরেই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, বেজেই চলেছে—বেজেই চলেছে—বেজেই চলেছে। মনে হ'ল, আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত বায়ুস্তর, জীব-মানব, বস্তুজগতের সকল অণু-পরমাণুতে প্রতিধ্বনি তুলে সে সঙ্গীত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, এক অভূতপূর্ব অনুভূতি অনুভব করলাম, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, এ তো রেডিওর যন্ত্রসঙ্গীত নয়,

কোন পার্থিব যন্ত্রে এমন সুর বাজে না, এ সঙ্গীতও বেদনার গান নয়, এ শুধু করুণা। শান্ত স্নিগ্ধ সান্ত্বনাময় অপরূপ সঙ্গীত! বুঝতে পারলাম, আমার নব উপলব্ধ অনুভূতিই আমাকে ব'লে দিলে, সকল সৃষ্টির অন্তর-লোকে এই সঙ্গীত অনাবদ্যন্ত কাল অনাহতভাবে বেজে চলেছে, এ সেই জীবন-সঙ্গীত। সৃষ্টি এবং ক্ষয়, জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে অমৃত দিয়ে সেতু-বন্ধন রচনার অপরূপ পরিকল্পনা-সঙ্গীত।

অকস্মাৎ বাতাসের ঝটকায় খুলে গেল একটা জানালা। বাতাসের ঝলকের সঙ্গে জনতার কোলাহল এসে কানে পৌছুল; চকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম, সে সঙ্গীত আর শুনতে পাচ্ছি না, কোলাহলে যেন তাকে ঢেকে দিয়েছে, গ্রাস করে নিয়েছে রাক্ষসের মত। জানালাটা বন্ধ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

খবরের কাগজের আপিসের সামনে ক্রুদ্ধ জনতা প্রশ্ন করছে, কে সে? কে? হিন্দু তো বুঝলাম, কিন্তু কে সে? কি নাম? কোন্ দেশের লোক? কোন পার্টির লোক? বলুন। বলতে হবে। আমরা জানতে চাই।

জনতার প্রশ্নে অভিভূত মস্তিষ্ক চকিতে সচেতন হয়ে উঠল।

হিন্দু? পাঞ্জাবের দাঙ্গায় দুর্গত সর্বস্বহারা কোন উন্মাদ? অথবা কোন রাজনৈতিক দলের কোন ষড়যন্ত্রী? বার্মার মন্ত্রীমণ্ডলী হত্যার কথা মনে প'ড়ে গেল। হতভাগ্য ভারতবর্ষের! সদ্যলব্ধ স্বাধীনতা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার আয়োজন চলেছে, গুপ্ত মন্ত্রণা চলেছে, ক্ষমতা-লোলুপতার খেলা চলেছে বিভিন্ন নেতা নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে এই অনুমানই সত্য। এই সত্য! এই তো কয়েকদিন আগে মহাত্মাজীকে হত্যার জন্য বোমা ছুঁড়েছিল। আজই যখন মহাত্মাজী হত হলেন দিল্লীতে

ঠিক সেই সময় খবর এল—অমৃতসরে পণ্ডিতজীর সভায় দুজন লোক ধরা পড়েছে বোমা নিয়ে।

কে এরা? কারা এই ষড়যন্ত্রকারী দল? ক্ষোভে ঘৃণায় অন্তর ভ'রে উঠল। নির্বাকক্ষোভে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কে এরা? কারা? কারা?

জানালাটা বন্ধ ক'রে ফিরলাম। সঙ্গে সঙ্গে কেউ যেন কথা বলে উঠল—আমি—আমি তাদের নেতা।

ঘরখানির অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে কেউ যেন উত্তর দিলে। চমকে উঠলাম। প্রশ্ন করলাম কে?

আমি।

আলোর সুইচে হাত দিতে গেলাম। কিন্তু স্বর শুনলাম, থাক। আলো জ্বেলো না।

আলো জ্বালব না?

না।

আলো না জ্বাললে তোমায় দেখব কি ক'রে?

অন্ধকারের মধ্যেই আমাকে দেখতে পাবে। যে হেতু না, অন্ধকার থেকেই আমার উদ্ভব, অন্ধকারই আমার কায়ার উপাদান, অন্ধকারই আমার জননী ;—আলোক আমার বিমাতা। বিনতানন্দন গরুড়ের আবির্ভাবে আত্মরক্ষার জন্য কদ্রুর সন্তান সর্পকুলকে যেমন আত্মগোপন করতে হয়, তেমনই ভাবেই আত্মরক্ষার জন্যই আমাকে আলো থেকে দূরে থাকতে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে আমার বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে অন্ধকারের মধ্যে কেউ যেন এসে দাঁড়াল। অন্ধকারের মধ্যেও গাঢ়তর অন্ধকারের মত সে

মূর্তি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে আরম্ভ হ'ল। শিলামূর্তির মত কঠোর পেশীবদ্ধ দেহ, ঈষদ্দীপ্ত তীক্ষ্ণ ক্রুর দৃষ্টিসম্পন্ন ক্ষুদ্র চক্ষু, ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসে স্ফীত স্থূল নাসা, তিক্ততার বক্রভঙ্গিতে দৃঢ়বদ্ধ দীর্ঘ স্থূল ওষ্ঠাধর ; গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে সে ভূষিত, বিবিধ মারণাস্ত্রে সজ্জিত সে মূর্তি। বিস্ময়ে আতঙ্কে হতবাক হয়ে আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম, সমগ্র পারিপার্শ্বিক যেন পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে, আমার চারি পাশে পৃথিবী নাই, সৃষ্টি নাই, আছে শুধু অন্ধকার—আর অন্ধকার—অন্ধকার। অন্ধকারাচ্ছন্ন কোন ঘন অরণ্যলোকের মধ্যে কঠিন শিলাতলে ব'সে আছি। দেখতে পাচ্চি, সম্মুখে সে ব'সে আছে, চোখে তার অন্ধকার-পর্বতগহ্বরে উপবিষ্ট ব্যাঘ্রের চক্ষুদীপ্ত, তার শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে নাশ-নিশ্বাসের ধ্বনির স্পর্শ। সে দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ প্রকাণ্ড রোমশ হাতখানা একটি শিলাখণ্ডের উপর রেখে বললে, আমারই নির্দেশে নিহত হয়েছে তোমাদের গান্ধী। এই মাত্র তুমি অন্তরে অন্তরে প্রশ্ন করছিলে, কারা এই ষড়যন্ত্রীর দল ? তাই আমি এসেছি। আমিই নেতা। আমারই নির্দেশ।

কে তুমি ?

আমি ? চেন না আমাকে ? সে হাসলে। সে হাসি দেখে আমি শিউরে উঠলাম। হাসি মানুষকে এমন ভয়ঙ্করদর্শন ক'রে তুলতে পারে এর পূর্বে আমার কল্পনাতীত ছিল। সে বললে, তুমি আমাকে জান, আমাকে চেন, পৃথিবীর সকল জীবনের মধ্যে আমার অধিকার, আমি আছি। কিন্তু এমনভাবে কখনও আমাকে দেখ নি, দেখতে চেষ্টা করনি। আমি হিংসা।

হিংসা !

ঘৃণা করছ আমাকে? দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে সে আস্ফালিত করলে, উত্তেজনায় চোখের দৃষ্টি প্রখরতর হয়ে উঠল অগ্ন্যুত্তপ্ত ধাতু-গোলকের মত।

আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত ছিল একখানি হাস্যসুন্দর মুখ; ওই ভয়ঙ্করদর্শন হাসি দেখামাত্র প্রতিক্রিয়াবশে স্মরণে উদিত হয়েছিল শশাঙ্করেখার মত মধুর হাস্যময় গান্ধীজীর মুখ। তার প্রশ্নে, তার দৃষ্টিতে তার বহু-আস্ফালনে আমাকে বিচলিত করতে পারলে না, আমি শান্ত সংযত কণ্ঠে সত্য উত্তর দিলাম; কিনা ঘৃণা জানি না কিন্তু তোমার ওই ভয়ঙ্করদর্শন হাসি দেখে সঙ্কুচিত হচ্ছি। না হয়ে পারছি না।

আমার প্রকৃতিদত্ত এই রূপ। আমি কি করব? জান আমার পরিচয়? আদ্যাশক্তি থেকে আমার উদ্ভব! আমি শক্তির পুত্র।

শক্তির পুত্র?

হ্যাঁ, শক্তি আদ্যাশক্তির এক চক্ষে উষ্ণতাবর্ষী দীপ্তি অর্থাৎ আলোক, অপর চক্ষে হিমবর্ষী তমসা—অন্ধকার, তৃতীয় নেত্রে জ্যোতিঃ—অবর্ণনীয় তার রূপ ও স্পর্শ। সৃষ্টির প্রারম্ভে, সৃষ্টি চাইলে তাঁর প্রসাদ, তিনি দুই চক্ষু দিয়ে চাইলেন সৃষ্টির দিকে। তৃতীয় নেত্র থাকল ঊর্ধ্বে আবদ্ধ। দুই চক্ষু থেকে পৃথিবী পেলে দিবা এবং রাত্রি,—আলোক এবং অন্ধকার বস্তুজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত হ'ল অন্ধকার-চোখের ছায়া, হীরকে সঞ্চারিত হ'ল আলোক-চক্ষের প্রসাদ; প্রতিটি অণু প্রতিটি পরমাণু আলোক এবং অন্ধকার—জীবন এবং মৃত্যুর শক্তিতে বলশালী হয়ে উঠল, জীব-জগৎও পেলে উভয় নয়নের দৃষ্টির প্রসাদ, অলোক-নয়ন থেকে সৃষ্টি হ'ল—সাহসের, স্নেহের, সারল্যের, সংযমের। বস্তুজ্ঞান তাদের শাস্ত্র। এদের নেতারূপে আবির্ভূত হ'ল শৌর্য। অন্ধকার থেকে সৃষ্টি হ'ল—ভয়, লোভ, মোহ। এদের নেতারূপে আবির্ভূত

হলাম আমি। আমার নাম হিংসা। স্বার্থবুদ্ধি আমাদের শাস্ত্র। আলোক-সন্তান শৌর্যের প্রতিদ্বন্দ্বী আমি। ক্রোধ, ঘৃণা, লোভ, স্বার্থ, মোহ আমার সহোদর ; অন্ধকার থেকে আমাদের সৃষ্টি।

অকস্মাৎ সে উঠে দাঁড়াল। দুই হাত ক্ষোভে শূন্যলোকে প্রসারিত ক'রে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করলে, তারপর হাত নামিয়ে আক্ষেপপূর্ণ কণ্ঠে বললে, জান, আমার কত ক্ষোভ ! আমার ক্ষোভের কাছে পৃথিবীর সপ্ত সমুদ্র গোষ্পদতুল্য। আমাদের দুঃখের কাছে পৃথিবীর অরণ্যানীর অন্ধকার তুচ্ছ। আমিই ছিলাম একদা পৃথিবীতে জীব-জীবনের একচ্ছত্র কেন্দ্রপতি। আমার সহোদরেরাই ছিল তাদের জীবনের সকল দিকের দিকপাল। অন্ধকার শিলাময় গুহায়, অরণ্যানীর আলোকহীন তলদেশে, সমুদ্রের জলরাশির অভ্যন্তরে জীবজগৎকে স্মরণ কর। একচ্ছত্রাধিপতি আমি সেখানে। একমাত্র মাতৃস্নেহের মধ্যে আলোকের সৃষ্টির অধিকার ছিল। শক্তি নারীরূপিণী; মাতার স্নেহ আমরাও ভোগ করেছি, তাই তাকে স্থান দিতে আপত্তি করি নি। কিন্তু আশ্চর্য ! আশ্চর্য !

সে স্তব্ধ হ'ল।

প্রশ্ন করলাম, কি আশ্চর্য ?

আলোক-নয়নের সৃষ্টির শক্তি ; জীব-জীবনের মধ্যে থেকে সে আরম্ভ করলে তপস্যা।

কার তপস্যা ?

ওই ঊর্ধ্বগত তৃতীয় নয়নের তপস্যা। তৃতীয় নয়নের প্রসাদ পেলে। বহুজন্মের মধ্য দিয়ে জীবজগৎ লাভ করলে মনুষ্যজন্ম। তৃতীয় নয়ন তাকে দিলেন চৈতন্য, আত্মজ্ঞান, প্রেম। আর একটা সর্বনাশা বস্তু তাকে দিলেন—করুণা। সঙ্গে সঙ্গে আমিও আরম্ভ করলাম তপস্যা।

তুমিও তপস্যা আরম্ভ করলে ?

করলাম বইকি। করেছি বইকি তপস্যা। কঠিন—কঠোর তপস্যা করেছি আমি। কোটী কোটী বৎসর তপস্যা করেছি। আজও কি সে তপস্যার বিরাম আছে ? শীত ঋতুতে অনাহারী, বিবর-বিহারী সাপকে দেখেছ ? তারই মধ্যে চলেছে আমার তপস্যা। বর্ষণমুখর গভীর অমাবস্যার রাত্রে প্রতীক্ষমান পথিক-হত্যাকারীর চিত্র কল্পনা করতে পার ? দুর্য্যোগ মাথায় ক'রে সেই আমার তপস্যা আমার তপস্যাতেই তো দৈত্যজননী দিতি হলেন পুত্রবতী। মানবের সঙ্গে সৃষ্টিতে আবির্ভূত হ'ল দৈত্য দানব অসুর। বার বার আমি অসুরের মধ্যে জন্ম নিয়েছি; শক্তির তপস্যায় শক্তিকে তুষ্ট করেছি, বরলাভ করেছি। রক্তবীজের নাম শুনেছ ? মহিষাসুরের নাম শুনেছ ? আমি—আমিই তার মধ্যে আবির্ভূত হয়েছি।

জানি। তুমি বার বারই বিনষ্ট হয়েছ শক্তির দ্বারা।

সেই তো আমার জয়। সেইখানেই তো লাভ করেছি আমি নবজন্ম রক্তপাতে আমার আনন্দ' সে আনন্দ আমার পরিস্ফুট হয়েছে শক্তির শূলাঘাত নিঃসৃত আমারই রক্তধারায়। মাতা হলেন পুত্রহন্ত্রী এর চেয়ে বড় জয় আর কি হবে আমার ! তাই তো দেখতে পাবে, রাবণরূপে যখন আবির্ভূত হলাম, তখন শক্তি আবির্ভূত হন নি ; আমার সঙ্গে যুদ্ধ, আবির্ভূত হলেন এক কোমলতনু শ্যামকলেবর ছেলে তোমাদের সীতাপতি রাজারাম। চণ্ডীর "ইত্থং যদা বাধা দানোবোত্থা ভবিষ্যতি, তদা তদা অবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ং" মনে আছে ? এই কারণেই ওই উক্তি ক'রেও তিনি আর আবির্ভূত হন নি। তাঁর পরিবর্তে এলেন রাম। মানুষ। দেবতার চেয়েও ভয়ঙ্কর শত্রু আমার।

তোমার কথার যুক্তি কোথায়? রামচন্দ্রের হাতে রাবণের মৃত্যুও তো রক্ত পাতের মধ্যে!

হ্যাঁ হ্যাঁ। রক্তপাতের মধ্যে। কিন্তু তবু প্রভেদ আছে। তুমি বুঝবে না। আমি উপলব্ধি করেছি। বিচিত্র সে উপলব্ধি। মহাশক্তির শূলাঘাতে মহিষাসুর-জন্মের অবসান হ'ল, ঝ'রে পড়ল আমার রক্তধারা, শক্তির দিকে চেয়ে দেখলাম, সে মুখে জয়ের উল্লাস নাই মমতার বেদনা নাই, নির্লিপ্ত নিরাসক্ত দৃষ্টি; অবয়ের চাঞ্চল্য নাই, নিবাত-নিষ্পন্দ অগ্নিশিখার মত স্থির সে মূর্তি। রক্তবীজ-জন্মের অবসান আরও বিচিত্র। সেখানে লোলজিহ্বা প্রসারিত ক'রে মহাশক্তি আবির্ভূত হলেন চামুণ্ডারূপে, আমারই সহোদর ক্রোধকে সহায় ক'রে শেষ রক্তবিন্দু পান ক'রে রক্তবীজকে হনন করলেন। আমি আক্রোশে দ্বিগুণিত শক্তি নিয়ে পুনর্জন্ম লাভ করলান। বিব্রত হলেন, চিন্তিত হলেন, শক্তি। মানুষ তখন বললেন, এ ভার আমি নিলাম। হে জননীরূপিণী দেবতা, এ তোমার করণীয় নয়। তোমার তৃতীয় নয়নের প্রসাদ আমাকে করেছে অমোঘ বলশালী। আমিই নাশ করব রাক্ষসরূপী হিংসাকে। আমি হেসেছিলাম মনে মনে। রামচন্দ্রের শরাঘাতে রক্তস্রোতের মধ্যে শায়িত হয়ে যখন আমি চিন্তা করছি, পরজন্মে কোন ভয়ঙ্কর রূপ আমি গ্রহণ করব তখন রামচন্দ্র বিনীতভাবে ম্লানমুখে এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। মহাবীর ব'লে আমাকে সম্বোধন ক'র আমার মৃত্যুতে করুণায় নয়নাশ্রু বিসর্জন করলেন।—সঙ্গে সঙ্গে অভাবনীয় অচিন্ত্যপূর্ব ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেল!

অকস্মাৎ বিচলিত হয়ে দুই হাতে মুখ আবরিত করলে সে। সর্বদেহে একটা কম্পন সঞ্চারিত হয়ে গেল।

আমি মোহগ্রস্তের মত শুনেছিলাম সেই ভীমদর্শন কৃষ্ণকায় পুরুষের কথা। কৌতূহলের সীমা ছিল না। কৌতূহলবশবর্তী হয়েই প্রশ্ন করলাম, কি সে সংঘটন?

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিরতিশয় কাতর ক্লান্ত কণ্ঠে সে বললে, বিচিত্র সংঘটন! ওই বিজয়ী শ্যামকলেবর তরুণ মানব-পুত্রের আয়ত চোখ দুটি থেকে ঝ'রে পড়ল যে উষ্ণ অশ্রুধারা, সেই অশ্রুর স্পর্শে আমি বিগলিত হয়ে গেলাম, হ্যাঁ, বিগলিত। গ'লে গেল আমার অসুর রাক্ষসরূপের কায়া, ঝ'রে গেল কায়ার কদর্যতা।—আমি পেলাম নবরূপ। পুরাণ খুঁজে দেখ, ইতিহাস খুঁজে দেখ, অসুর-রাক্ষসরূপে আর আমাকে পাবে না। এই আমার প্রথম পরাজয়। অস্ত্রে আমার রক্তপাত ঘটেছে, কিন্তু পরাজয় ঘটে নি। মানুষের শৌর্য করুণার সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার অসুর-জন্মের অবসান ঘটিয়ে আমাকে শক্তিহীন করলে। তীক্ষ্ণদন্ত, প্রখর নখ, বিশালদেহ হারালাম, হারালাম রক্তপানের রুচি, হারালাল নরমাংসভক্ষণের প্রবৃত্তি।

অস্থির হয়ে উঠল সে। আবিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ব'সে রইলাম। কয়েক মুহূর্ত পরে স্থির হয়ে একটা গম্ভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ বললে, পরজন্মে আমি আবির্ভূত হলাম কৌরব-বংশে, অন্ধের ঔরসে দম্ভ স্বার্থ মত্ততাকে সহায় ক'রে দুর্যোধনের মধ্যে। আমার খেলা আরম্ভ করলাম পাণ্ডবদের পীড়ন ক'রে, তাদের রাজ্য অপহরণ ক'রে। পীড়িত হ'ল আলোক-নয়নের প্রসাদ, তৃতীয় নয়নের প্রসাদ বিচলিত হ'ল। আমার প্রভাবে, আমার তাড়নার তারা হ'ল পঞ্চ-পাণ্ডবের মতই নির্বাসিত, নির্যাতিত; দ্রৌপদীর মতই লাঞ্ছিত। অমিতবীর্য ব্রত্যরূপী ভীষ্ম অন্নমূল্যে আমার কাছে হলেন আত্মবিক্রিত;

বিজ্ঞানের শৌর্যকে ক্রয় করলাম সম্পদ-মূল্যে; পুত্রের দুঃখের মূল্যে দ্রোনরূপী ব্রাহ্মণের শাস্ত্রবিজ্ঞানকে করলাম আজ্ঞাবহ দাস। আরম্ভ হ'ল দ্বন্দ্ব। শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠিরের পাশে। আরম্ভ হ'ল কুরুক্ষেত্র। এবার কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ নিজে অস্ত্রধারণ করলেন না। শুধু তাই নয়, আমাদের মৃত্যুতে আমার মা তাঁকে দিলেন অভিসম্পাত, সে অভিসম্পাতকে তিনি সসম্মানে শিরোধার্য করলেন। এর ফলে আমার ঘটল আবার পরাজয়। মহানায়কের বীরজন্ম লাভের শক্তির আমার অবসান ঘটল। সাধারণ মানুষের অন্তরের মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম। তৃতীয় নয়নের প্রসাদ—আত্মজ্ঞানের বিপক্ষে, প্রেমের বিপক্ষে স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা বস্তুজ্ঞানকে আয়ত্ত ক'রে অভিযান আরম্ভ করলাম। কিন্তু তবু আমার শান্তি নাই, তবু আমার স্বস্তি নাই, আমার শত্রু আবার আবির্ভূত হ'ল। নূতন তার যুদ্ধনীতি। তৃতীয় নয়নের মহাপ্রসাদ সে এই মহাশক্তি—করুণা, প্রেম, সেই বলে বলীয়ান হয়ে এল এক মানুষ। মুণ্ডিতমস্তক, নয়নে দিব্যদ্যুতি ওই—ওই শক্তির তৃতীয় নয়নের জ্যোতির প্রতিচ্ছটা তার চোখে, অধরে শান্ত হাস্য, রসনায় মধুর ভাষা, পরিধানে গৈরিকবস্ত্র, হাতে ভিক্ষাপাত্র, বললেন, আমার এই ভিক্ষাপাত্রে দাও তোমার অন্তরের হিংসাকে, তোমরা গ্রহণ কর আমার অহিংসা। মহাবীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আত্মজ্ঞান ও করুণা, তারই নাম অহিংসা। মৃত্যুর পরিবর্তে গ্রহণ কর অমৃত। জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে রচনা কর শান্তি এবং প্রেমের স্বর্ণসেতু। উত্তীর্ণ হও জন্ম মৃত্যুর পরপারে অমৃতলোকে। রাজার ছেলে গৌতম, তৃতীয় নয়নের তপস্যার করুণাকে অজস্রধারায় অমৃতের মত বিতরণ ক'রে দিলেন আমার প্রভাবজর্জর মানুষের সমাজে। রাজচক্রবর্তী অশোক করলেন সর্বস্বত্যাগ, কলিঙ্গযুদ্ধে

আমার ক্রীড়নক চণ্ডাশোক—ওই অমিতাভ বুদ্ধের অমৃত স্পর্শে আমাকে ত্যাগ ক'রে হ'ল ধর্মাশোক। দেবদত্তের মধ্যে আমি হলাম পরাভূত। উন্মত্ত হস্তীর মধ্যে আমি হলাম লজ্জিত, অভিভূত, পরাজিত। সে এক অপরূপ সম্মোহন! দেখেছ কখনও মন্ত্রসম্মোহিত সর্প? আমার অবস্থা হল ঠিক তাই। বুদ্ধের তিরোধানে আবার হলাম জাগ্রত। আমাকে জাগ্রত করে তুললে স্বার্থ, আমাকে জাগ্রত করে তুললে লোভ, আমাকে জাগ্রত করে তুললে ক্রোধ, মন্ত্রণা দিলে স্বার্থবুদ্ধি। একটা স্বপ্ন থেকে যেন জেগে উঠলাম। কঠিন ক্রোধে জাগ্রত হলাম। খুঁজে বের করলাম নূতন লীলাক্ষেত্র। গ্রীস দেশে ছুটে গেলাম, রোম রাজত্বে ছুটে গেলাম; নূতন করে আরম্ভ হল আমার অবাধ রাজত্ব। রক্তাক্ত রূপচক্রে অভিযান চলল আমার। দেশের পর দেশের মানুষ হল পদানত, পরাজয়ের জ্বালা দিয়ে হৃদয়ক্ষেত্র পুড়িয়ে দিয়ে সেই দগ্ধ ক্ষেত্রে পাতলাম আমার আসন। কিন্তু—

আবার একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললে, কিন্তু আবার এল আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। কুমারীর গর্ভে হ'ল তার জন্ম। সে বললে, ঈশ্বর আমার পিতা।

কে? ক্রাইস্ট?

হ্যাঁ! মেরীর শিশু। যীশু। জিসাস ক্রাইস্ট। ক্রসে বিদ্ধ ক'রে আমি তাকে হত্যা করেছিলাম।

আতঙ্কে শিউরে উঠল সে। তার তীক্ষ্ণ তীব্র কৃষ্ণ দ্যুতিময় ক্ষুদ্র চোখ দুটি ক্ষণিকের জন্য সভয়ে মুদিত হ'ল, আর্তকণ্ঠে বললে, মৃত যীশু এবার আক্রমণ করলে মানুষের অন্তরের গুপ্তস্থানে। সেখানেই এক সোমবারে তার ঘটল পুনরাবির্ভাব। আমি ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলাম দুর্গম

মধ্য এশিয়ায়। সেখান থেকে আবার অভিযান চালালাম নিষ্ঠুর আক্রোশে। হূনদের নিয়ে এটিলা চলল আমার নির্দেশে ইউরোপে। মিহিরকুল এল ভারতবর্ষে। এর পর সুদীর্ঘ কাল চালিয়ে এসেছি আমারা আবার রাজত্ব। আলোকের সৃষ্টি—শৌর্য লোভের বশবর্তী হয়ে, স্বার্থবুদ্ধি-প্রভাবিত বস্তুজ্ঞানের প্ররোচনায় হ'ল আমার সহায়। এই বস্তুজ্ঞানকে স্বার্থবুদ্ধি প্রভাবিত ক'রে রূপান্তরিত করলাম শুষ্কজ্ঞানে। অভিনব কৌশলে আলোকের সৃটির মধ্যে বাঁধলাম বাসা। তাদের করলাম প্রধান, আমরা থাকলাম পশ্চাতে, অধীনতা স্বীকার ক'রেও হলাম তাদের সত্যকার পরিচালক। শুষ্কজ্ঞান লাভ করলে গুরুর পদ। সে বললে, এই নূতন পথই সত্য অনুসরণ কর এই পথ। মিথ্যা তৃতীয় নয়নের প্রসাদ ওসব হ'ল ভ্রান্তি মোহ। তার অস্তিত্ব পর্যন্ত কর অস্বীকার। শৌর্যের অন্তরালে থাকলাম আমি হিংসা। সে নূতন ঘোষণা-পত্র দিলে মানুষের সমাজে—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। জয় কর পৃথিবী।" বস্তুজগৎ থেকে মৃত্যু-শক্তিকে করলে গ্রহণ। অসুর রাক্ষসের জন্মে যে সমৃদ্ধি, যে গৌরব, যে প্রতিষ্ঠা আমি লাভ করি নি, তাই লাভ করলাম মানুষের জন্মে। রক্তাক্ত ক'রে দিলাম পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা।

আত্মতৃপ্তিতে সে তীক্ষ্ণাগ্র দন্তপংক্তি প্রকট ক'রে দীর্ঘওষ্ঠাধরবিস্তারী হাসি হাসলে! আমি ভীত হলাম। বললাম, তুমি হেসো না। তোমার হাসিতে আমার ভয় হয়।

সে বললে, হবারই কথা। কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করলে মানুষ পীড়িত হয় না, কিন্তু সে গান করলে সহ্য করা যায় না। জানি, স্বীকার করি।

আমি বললাম, তুমি নিষ্ঠুর অট্টহাস্য কর, সে হাসি সহ্য করব; কিন্তু এ হাসি নয়।

সে বললে, কি করব! সে হাসি হাসবার যে উপায় নাই। মানুষের মধ্যে আমার অকপট রূপের যে আর স্থান নাই। আমাকে চলতে হয়, ফিরতে হয় ছদ্মবেশে, কপট ভাষায় কথা বলতে হয়, অনুকরণ ক'রে বিকৃত কণ্ঠে—কোথাও মিষ্টতার, কোথাও মর্যাদার ভান করতে হয়। কাইজারের যুদ্ধঘোষণা-পত্র পড়েছে? ভার্সাইয়ের সন্ধিপত্রের ভাষা দেখেছ? পড়েছ ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংরেজের ঘোষণা-পত্র হিটলারের বক্তৃতা শুনেছ? চার্চিলের উক্তি স্মরণ করতে পার? সর্বত্র—সর্বত্র প্রচ্ছন্নভাবে আছি আমি।

গভীর আত্মতৃপ্তিতে সে অহঙ্কৃত হয়ে উঠল, স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল গাঢ় অন্ধকারের দিকে। বুঝলাম, আপনার অহঙ্কারকে সে পরিতৃপ্তিসহকারে উপভোগ করছে।

এবার আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলে পারলাম না। সে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল দীর্ঘনিশ্বসে ফেলছ যে?

বললাম, তুমি সত্য বলেছ। জয় তোমারই হয়েছে। সৃষ্টির আলোক-নয়নের সন্তানদের তপস্যা ক্লান্ত হয়ে ব্যর্থ হয়েছে।

অকস্মাৎ ক্রোধে সে যেন অধীর হয়ে উঠল, বললে, তুমি মিথ্যা কথা বলছ।

মিথ্যা বলছি?—বিস্মিত হলাম আমি।

হ্যাঁ। তোমার অন্তর আমি দেখতে পাচ্ছি। এ তোমার অন্তরের সত্য নয়।

আমি প্রবলতর বিস্ময়ে আমার মনের দিকে চাইলাম। সে গভীর কণ্ঠে বললে, আমি জানি, আমি জানি, এই যে ভূখণ্ড—এই যে ভারতবর্ষ, এর মানুষ তোমরা অতি বিচিত্র ধাতুতে গঠিত। এখানে যত

পরাজয় যত আঘাত আমাকে পেতে হয়েছে, এত আঘাত কোন দেশে আমাকে পেতে হয় নি। অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে, পরাধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ভূখণ্ডে অবাধে চালিয়ে চলেছিলাম আমার রাজত্ব। বুঝতে পারি নি, এখানে চলছে সেই তৃতীয় নয়নের তপস্যা। অনুমান করা আমার উচিত ছিল। হ্যাঁ, উচিত ছিল। যুদ্ধের পরও এখানে অনেক শত্রু জন্মেছে আমার। কবীর, চৈতন্য—নানক—অনেক অনেক। এখানকার মানুষেরা রক্তের ধারার মধ্যে পুরুষানুক্রমে বহন ক'রে নিয়ে চলেছে ওই সাধনার ধারা। সেই সাধনায় জন্ম নিল এই মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিয়ে যখন সে অহিংসাকে প্রচার করে, তখন আমি বিব্রত হয়েছি; কিন্তু তবুও প্রত্যাশা করেছিলাম, এ অহিংসা ওর কূটবুদ্ধির ছদ্মবেশ। আমার আশ্বাস ছিল, গান্ধী জয়যুক্ত হ'লেও আমি নূতন আসন পাব উভয় দেশের মানুষের মধ্যে। কিন্তু ভ্রম—এত বড় ভ্রম আর হয় না। আজও পর্যন্ত আত্মজ্ঞান, প্রেম, বীর্যের সাধনায় এমন অপরূপ সিদ্ধি কেউ লাভ করে নাই। আমার এত বড় পরাজয় আর কোথাও ঘটে নাই। এত শুভ্র জ্ঞানময়, এমন বীর্যময় অহিংসাকে জীমূতবাহনের মত নবজন্ম কেউ দেয় নাই। ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে এক সুরে গেঁথে আমাকে এই ভূখণ্ড থেকে বিতাড়নের—

হঠাৎ সে স্তব্ধ হ'ল। তারপর গাঢ় স্বরে বললে, বিতাড়নের নয়, বিতাড়নের নয়। আমার সকল কদর্যতার অবসান ঘটিয়ে সে আমাকে বিগলিত ক'রে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিল মহাশক্তির মধ্যে। তাতে কি হ'ত জান?

কি হ'ত?

মহাশক্তির অন্ধকার-নয়ন প্রস্ফুটিত হ'ত। তৃতীয় ওই যে ঊর্ধ্বলোকে নিবদ্ধ হয়ে তপস্যামগ্ন—ওই নয়নের সঙ্গে অপর দুই নয়নের সংযোজন রচিত হ'ত। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে, আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটত; জন্ম ও মৃত্যুর সংযোজনে সৃষ্টি লাভ করত অমৃত; আলোক এবং অন্ধকারের সংযোজনে অন্তরলোক উদ্ভাসিত হ'ত অবিনশ্বর জ্যোতিতে। তাই—তাই এই মানুষটি ছিল আমার কঠোরতম শত্রু। তাকে কি আমি না সরিয়ে পারি?

তীব্র বিরক্তিতে আমার মন ভ'রে উঠল, আমি বললাম, কিন্তু এর জন্য ভারতবর্ষের হিন্দুকে কেন তুমি আশ্রয় করলে?

তুমি জান না। এমন ক্ষেত্রে স্বজাতি,—জ্ঞাতি এরাই আমার প্রধান আশ্রয়। গৌতমবুদ্ধের বিরুদ্ধে আমার ক্রীড়নক হয়েছিল তার নিকট-আত্মীয় দেবদত্ত, যীশুর বিরুদ্ধে আমার স্বপক্ষে পেয়েছিলাম তার স্বজাতিকে। সৃষ্টির মধ্যে এই সাধনায় আসে যে সাধকেরা, তাদের আবির্ভাবে আমি কঠিনতম আঘাত পাই তার নিকট-জনের হৃদয়ক্ষেত্রে, আলোড়ন সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক ওঠে সেইখানে। তাই সেইখানেই রচনা করি আমি আত্মরক্ষার যুদ্ধকেন্দ্র। শুষ্কজ্ঞান আমার শ্রেষ্ঠ সহায় মানুষের মধ্যে, সেই রচনা করে স্বার্থের পাষাণখণ্ডের ভিত্তির উপর সংকীর্ণতার উপাদান দিয়ে ভ্রান্ত আদর্শের ব্যূহপ্রাচীর। ময়দানবের দানবীয় শিল্পের কথা জান? জলপূর্ণ হ্রদকে মনে হয় তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্র; তৃণক্ষেত্রকে ভ্রম জল ব'লে। ঠিক তেমনই। অন্ধকারের আবরণ বিস্তার ক'রে দৃষ্টি করি আচ্ছন্ন, শুষ্কজ্ঞানের রচিত ব্যূহের অন্তরালে বীর্যকে করি উন্মত্ত। আমি আশ্রয় করি অস্ত্রের অগ্রভাগে।

জলতে লাগল তার চোখ! ভয়ঙ্করদর্শন হিংসা অধিকতর

ভয়ঙ্করদর্শন হয়ে উঠল। আমি নির্বাক হয়ে ব'সে শুনে গেলাম তার কথা।

সে বললে, শুষ্কজ্ঞানের প্রেরণায় হিন্দুর মনেই সঞ্চারিত করেছি হিন্দু স্বার্থহানির প্রচণ্ড ক্ষোভ। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ-বিদ্বেষে এ দেশে আমার যে জয়ধ্বনি উঠল, যে জয়যাত্রা চলল, তারই বিরুদ্ধে দাঁড়াল এসে গান্ধী স্তব্ধ হ'ল অভিযান। পশ্চাদ্‌পদ হতে হ'ল। আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে সবচেয়ে নিকটে পেলাম হিন্দুকে। দেখলাম, সেখানে ব্যূহ রচিত হয়ে আছে। তাকে অঙ্গুলিনির্দেশে দেখলাম ভ্রান্ত কল্যাণের আদর্শ, দেখালাম রাজনৈতিক অধিকারের উচ্চতম প্রতিষ্ঠার ছদ্মবেশী লোভ। উন্মত্তের মত সে চলল। গান্ধীর সম্মুখে এসেও সে বিচলিত হ'ল না। গুলি করলে। গান্ধীজী করজোড়ে প'ড়ে গেলেন রক্তাক্ত হয়ে মাটির উপর।

দুই হাতে আবার সে মুখ ঢাকলে। তারপর বললে, তার সে করজোড় নিবেদন—সে হ'ল মার্জনা। কাকে করলেন জান? আমাকে। হত্যাকারীকে নয় হত্যাকারী অবিচলিত আছে। সে তার ভ্রান্ত আদর্শ নিয়ে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করবে। কিন্তু আমি—আমি—

অকস্মাৎ সেই গাঢ় অন্ধকাররাশিকে মথিত ক'রে অট্টহাস্য যেন ধ্বনিত হয়ে উঠল। আমি যেন সম্বিত হারিয়ে ফেলছিলাম। তারই মধ্যে দেখলাম, সে থরথর ক'রে কাঁপছে তার কৃষ্ণবর্ণ মুখমণ্ডল শুষ্ক নীরস হয়ে এসেছে। সে অন্ধকার রাশির দিকে চেয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, মহাকাল।

আতঙ্কিত হয়ে আমিও অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্নের আকারে তার কথাটির পুনরুক্তি করলাম, মহাকাল?

হঁ্যা মহাকাল। ব্যঙ্গ হাস্য ক'রে গেলেন। তারপর সে সেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে বললে, করবেই তো ব্যঙ্গ। তুমি তো শুধু রুদ্র নও, তুমি যে শিব, তুমি যে পরম বৈষ্ণব। সৃষ্টির সাধনার মধ্য দিয়েই যে চলেছে তোমার বৈষ্ণবীয় সাধনা। চলুক, আমিও দেব বাধা। জানি এ জয় আমার জয় নয়, এ আমার পরাজয়, কারণ এত দুর্বলতা আমি জীবনে কখনও অনুভব করি নি। আজ আমি ক্লান্ত এই অন্ধকার অরণ্যের মধ্য মাতৃক্রোড়ের আস্বাদন অনুভব করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে। জানি ও আবার আসবে, আবার করবে এই অহিংসার সাধনা। আমিও দেব বাধা—বার, বার, বার বার সম্ভবত এই ভূখণ্ডেই হবে সে পরীক্ষা।—বুদ্ধির দেশ—বিজ্ঞানের দেশ এ নয় এ দেশ চৈতন্যের দেশ ; হৃদয়ের দেশ অঙ্কের দেশ নয়—বিশ্বাসের দেশ। এই দেশেই সম্ভবত হবে বার বার আমার সঙ্গে যুদ্ধ। হব আমি দুর্বল থেকে দুর্বলতর। জানি, আমার মতই নব নব জন্মে রাম আসে কৃষ্ণ হয়ে, বুদ্ধ আসে যীশু হয়ে, যীশু আসে গান্ধী হয়ে, আবারও আসবে। নবমহাভারতের মহানায়কের মহাপ্রস্থানে আমার হ'ল নূতন পরাজয়, আমি ক্লান্ত' আমায় চেয়ে দীনতম আজ আর কে আছে? লোকে লোকে উঠছে মহানায়কের মহাপ্রস্থান জয়ধ্বনি ; মহাকাল করেছেন স্বস্তিবাচন। আর আমি? আমি প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছি অভিভূত চিত্তে সেই চরম দিনের, যে দিন শেষযুদ্ধে হবে আমার জীবন্মুক্তি। কবে? সে কবে?

সে কণ্ঠস্বর অদ্ভুত, তাতে রোষ নাই, আবেগ নাই, ক্ষোভ নাই, ক্রোধ নাই ; আত্মসর্পিতের শ্রদ্ধান্বিত মর্যাদাময় কণ্ঠস্বর' ভৈরবী রাগিনীর মত ধ্বনিত হচ্ছিল।

অকস্মাৎ দরজায় কে ধাক্কা দিলে। দরজায় খিল দেওয়া হয় নি; খুলে গেল। আলোয় ভ'রে গেল ঘর। সত্ত ঘুমভাঙা বাড়ীর শিশুটি ঘর থেকে বেরিয়ে কাউকে না পেয়ে আমার সন্ধানে এসেছে। দেখলাম রাত্রি প্রভাত হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে সমস্ত রাত্রি যা দেখেছি, জানি না—সে স্বপ্ন, না কল্পনা। কিন্তু আমার কাছে তা মিথ্যা নয়।

রেডিওতে গান আরম্ভ হ'ল—

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী…

শান্ত হে—শুভ্র হে—হে অনন্তপুণ্য—

করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।··

মহাত্মার জয় হোক। এ তো মহাত্মারই বন্দনা! মহাকবি বাল্মীকি রামজন্মের পূর্বে করেছিলেন রামায়ণ-রচনা। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন মহাত্মার বন্দনা। ধ্বনিত হোক হৃদয়ে হৃদয়ে এই গান। রচিত হোক অহিংসার সাধকের নবজন্মের জীবনক্ষেত্র। সমগ্র মানব-সভ্যতা অহিংসা চায়, শান্তি চায়। জন্মও মৃত্যুর মধ্যে সেতু বন্ধনে উত্তীর্ণ হতে চায় অমৃতলোকে। আলোক এবং অন্ধকারের সংযোজনে মানুষের অন্তরে অন্তরে উদ্ভাসিত হোক উদয়-অস্তহীন জ্যোতির্লোক। বহু বিলম্ব আছে জানি, তবু হে মহাত্মা, তোমার আত্মদানের ভরসায় অকুণ্ঠ ঘোষণায় বলতে চাই—সে দিন আসবে।

কবিকণ্ঠের অমৃত বাণী পেয়েছি, মঙ্গলময় পুরুষের দক্ষিণপাণির স্পর্শ পেয়েছি, করুণাঘন ধরণীতল একদা কলঙ্কশূন্য হবেই। সেদিন যেন আমি নবজন্মে ফিরে আসি। নবজীবনে লাভ করি মহাজীবন।

গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী

অনেক দিনের—পাঁচ বৎসর পূর্বের কথা!

গ্রামে সেদিন প্রথম রেলগাড়ী আসবে।

ছোট একটি ব্রাঞ্চ লাইন কনস্ট্রাক্সনের সময়, মাপ জোক হইয়া গেছে—'দাগ-বেল' ও কাটা হইয়াছে, এইবার মাটি দিয়া বা প্রয়োজনমত কাটিয়া লাইন বসাইবার জন্য পাকা পথ প্রস্তুত হইবে। তাহার পূর্বেই কোথাও অল্প কাটিয়া কোথাও মাটি ফেলিয়া অস্থায়ীভাবে রেল লাইন পাতা হইতেছে। সেই রেল লাইন বহন করিয়া একখানা ছোট হাল্কা ইঞ্জিন কয়েকখানা ছোট মালগাড়ী লইয়া সঙ্গে সঙ্গেই আসিতেছে। গাড়ী হইতে কাঠের স্লিপার এবং লাইন লইয়া প্রায় শতখানেক কুলির একদল অত্যন্ত ক্ষিপ্র নিপুণতার সহিত স্লিপার পাতিয়া দিতেছিল, একদল তাহার উপর ফেলিতেছিল লোহার লাইন, আর একদল লম্বা সাঁড়াশী ও হাতুড়ির সাহায্যে ডগনেলগুলি ঠুকিয়া লাইনগুলি আঁটিয়া চলিয়াছে। লাইন খানিকটা পাতা হইলেই ছোট ইঞ্জিনটা সিটি মারিয়া গাড়ীগুলিকে টানিয়া আগাইয়া আসিতেছে। এইভাবে অগ্রসর হইতে হইতে ইঞ্জিনটা আজ এই গ্রামে প্রবেশ করিবে। সকালবেলা হইতেই ছেলের দল গ্রাম ছাড়াইয়া খানিকটাদূরে আগাইয়া গিয়া রেলগাড়ীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছিল। তাহাদের আনন্দের সীমা নাই। দিন রাত্রি ঘস্ ঘস্ করিয়া ট্রেণ চলিবে, সিটি দিবে পুঁ-পুঁ-পুঁ! তাহারা নিজেরাও ঐ রেলগাড়ী সাজিয়াছে—একজন হইয়াছে ইঞ্জিন—তাহার কোমর ধরিয়া

একজন—এমনি করিয়া পাঁচ সাত জন পরস্পরের কোমর ধরিয়া ছেলেগুলি ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। ইঞ্জিন ছেলেটি মুখে শব্দ করিতেছে—ঘস্-ঘস্-ঘস্-ঘস্! মধ্যে মধ্যে সিটি মারিতেছে—পুঁ!

কুলিগুলা অবিরাম মুখে গান হাঁকিয়া কাজ করিতেছে—মারো জোয়ান!

—হেঁই ওঁ।

—আওর থোড়া।

হেঁই ও।

ছেলেরা কান পাতিয়া শুনিতেছে, বোলগুলি তাহাদের বড় ভাল লাগিয়াছে। এমনি করিয়া গ্রামের প্রান্তভাগে যখন রেললাইন আসিয়া পৌছল তখন বেলা অপরাহ্ন। দর্শকের ভিড়ও ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। শুধু ছেলেরা না, যুবক বৃদ্ধের দলও আসিয়া জমিয়াছে। আমিও গিয়াছিলাম। তখন গ্রীষ্মের জন্য কলেজ বন্ধ হইয়াছে—কয়েকদিন পূর্বেই বাড়ী আসিয়াছি।

একজন সাহেব, খাঁটি ইংরাজ বলিয়া মনে হইল, লাইনের মুখে দাঁড়াইয়া কখনও বুট দিয়া কখনও বা হাতের ছড়ি দিয়া নির্দেশ দিতেছিল। খাঁকি শার্ট ও হাপপ্যাণ্ট পরিহিত জন দুই বাঙালী উবু হইয়া বসিয়া সেই নির্দেশ অনুযায়ী স্লিপার ও লাইন সরাইয়া নড়াইয়া ঠিক করিয়া দিয়া কুলিদের আদেশ দিতেছিল—ডগনেল লাগাও! মারো হাম্বার!

অদূরেই একটা অস্থায়ী কামারশালাও চলিতেছে।

সকলের পিছনে গার্ডসাহেব ঝাণ্ডা ও বাঁশী হাতে ঘুরিতেছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে একদল ছেলে জুটিয়া গিয়াছে।

লক্ষ করিলাম গার্ডসাহেব খুব হাত পা নাড়িয়া হরদম বক্তৃতা দিতেছেন। একটু অগ্রসর হইয়া ছেলের দলের কাছে গেলাম।

গার্ডসাহেবটি হরদম ইংরাজী ও ফিরিঙ্গী-বাংলা বলিয়া চলিয়াছেন।

তিনি তখন বুঝাইতেছিলেন—ভিলেজার কথাটা ছোট কথা—অসভ্য কথা আছে। বলবি না কখনো। বলবি রেসিডেণ্ট অফ দিস্ ভিলেজ, ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড—মানে বুঝনি তুমি? আঁ? ইউ মাস্টার—তুমি মহাশয়! লোকটি বেশ সুদর্শন। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা—বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ, টিকলো নাক—রংও বেশ ফরসা, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বলিলে অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। কিন্তু তবুও আমার মনে হইল লোকটা বাঙালী হইলেই ভাল হইত। মুখে এমন কতকগুলো চিহ্ন—যেন বাঙলা মায়ের আঁচল দিয়া মুখ মুছানোর চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে। মনে হয় চোখে কাজল—কপালে টিপ—চুলে তেল এককালে মাখানো ছিল। আমি কৌতূহলী হইয়া বেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার নাক ও কানের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। কোথাও যদি বেঁধার চিহ্ন থাকে। আবিষ্কার করতে পারলাম না!

গার্ডসাহেব আমার নিকট আসিয়া বলিলেন—গুড্ ইভনিং মাস্টার। ইয়োর নেম প্লিজ

আমি হাসিয়া বলিলাম, গুড্ ইভনিং। মাই নেম ইজ—অরুণকুমার মুখার্জী।

—ওয়েল মাস্টার মুকুর্জী—তোমার ত' খুব ভাল নাম! ভারী মিষ্টি! অরুণ মানে ত' দি সান্।

সবই তিনি ইংরাজীতে বলিতেছিলেন।

আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ। কিন্তু আপনার পরিচয় তো পেলাম না।

—ও—! আমি হচ্ছি জন আর্ডেন চ্যাটারসন। এই রেলওয়ের একজন গার্ড।

ভারী খুসী হ'লাম তোমার সঙ্গে আলাপ করে মাস্টার মুকুর্জী।

—আমিও খুসী হয়েছি মিস্টার চ্যাটারসন!

—কিছু মনে ক'র না—মাস্টার মুকুর্জী—তুমি কোন্ ক্লাসে পড়? এখানে একটা স্কুল আছে নয়?

—হ্যাঁ আছে! কিন্তু আমি এখানে পড়ি না, পড়ি কলেজে। আই-এ-পড়ি।

সবিস্ময়ে সে বলল—হ্যাঁ! ইণ্টার মিডিয়েট্ ইন্ আর্টস? আমি খুব খুসী হলাম মাস্টার মুকুর্জী।—কিন্তু তুমি এমন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছিলে বল তো?

একটু বিপদে পড়িলাম, অবশেষে সংকোচ কাটাইয়া কথাটা বলিয়া ফেলিলাম, বলিলাম—তুমি যেন বাঙালী হলেই ভাল হত।

চ্যাটারসনের চোখ দুইটা হঠাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—তুমি ছেলে মানুষ মুকুর্জী—তাই এ কথার জন্য তোমাকে ক্ষমা করছি আমি। আর কখনও এমন কথা বলো না যেন। চ্যাটারসন চলিয়া গেল—একটু দূরে ছোট ছেলেরা গোলমাল করছিল—সেখানে গিয়া চোখ দুইটা বড় করিয়া ঠোঁটের উপর আঙুল দিয়া বলিল—উস্। চুপ্! এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মিস্টার গিল্বার্ট! সে রাগ করবে।

একটা ট্রেন ওদিক হইতে আসিয়া থামিল। ইঞ্জিনীয়ার গিলবার্ট নামিলেন।

ওদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। সেদিনের মত কাজ বন্ধ হইয়া গেল। ছেলের দল ফিরিতে আরম্ভ করিল, আমিও ফিরিলাম।

—মাস্টার মুকুর্জী!

ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম চ্যাটারসন ডাকিতেছে। সে আমার কাছে আসিয়া বলিল—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, মুকুর্জী তুমি রাগ করবে না তো?

এদিক ওদিক চাহিয়া সে বলিল···এখানে তোমাদের একসাইজ শপ মানে মদের দোকান আছে?

হাসিয়া বলিলাম—আছে।

—কোন্‌দিকে যদি ব'লে দাও মুকুর্জী! আমি বেশী খাই না—একটু অল্প না হ'লে—। মার্জনা ভিক্ষা করার একধারার হাসি আছে, সে সেই হাসি হাসিল।

আমি বেশ ভাল করিয়া পথ নির্দেশ করিয়া দিলাম। সে এইবার বলিল—আর একটা কথা!

—কি বল?

আমাকে চার আনা পয়সা দেবে?

আমি অবাক হইয়া গেলাম। এত ইতর লোকটা? প্রথম আলাপেই একজন বিজাতীয় অপরিচিতের নিকট ভিক্ষা চাহিতেও লোকটার বাধে না? আর এই লোকটাই কিছুক্ষণ আগে রাগ করিরা আমাকে শাসাইতে চাহিয়াছিল!

অত্যন্ত রূঢ়ভাবেই বলিলাম, না। আমাকে মাপ করো তুমি!

সে কিন্তু একটুও আহত হইল না, বলিল—না-না। তুমিই আমার লজ্জাহীন আচরণ মাপ করো মাস্টার মুকুর্জী! অলরাইট্—গুডনাইট্।

সে হন্ হন্ করিয়া আমারই নির্দেশ অনুযায়ী সোজা পথটি ধরিয়া অগ্রসর হইল।

দিন চারেক পরই আবার তাহার সহিত দেখা হইল। তখনও আমাদের গ্রামের সীমানার মধ্যেই লাইন পাতা চলিতেছিল। লাইন অবশ্য গ্রাম ছাড়াইয়া খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে। তবুও বাজার-হাট এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সুবিধার জন্য এই গ্রামখানি তাহাদের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন রবিবার। সকালবেলায় আমাদের বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছি। এমন সময় দেখিলাম চ্যাটারসন হন্ হন্ করিয়া সম্মুখের রাস্তাটা দিয়া চলিয়াছে।

আমাকে দেখিয়াই সে অভিবাদন করিল গুড মর্ণিং মাস্টার মুকুর্জী!

আমি প্রত্যাভিবাদন করিলাম—গুড্ মর্ণিং মিস্টার চ্যাটারসন! আশা করি ভাল আছ!

ধন্যবাদ দিয়া সে জানাইল—হ্যাঁ সে ভালই আছে। তারপর প্রশ্ন করিল—এইটাই কি তোমার বাড়ী?

—হ্যাঁ। এস না, এলে খুব খুশী হব!

সে সঙ্কোচভরে বলিল—তোমার বাড়ীতে মেয়েরা—

হাসিয়া বাধা দিয়া বলিলাম—না, না, এটা আমাদের বাইরের বাড়ী; এখানকার সঙ্গে অন্দরের কোন সম্বন্ধ নাই!

—আই সি! কি বল তোমরা—বৈঠকখানা, না কি? ওঃ সুন্দর বৈঠকখানা তোমার মুকুর্জী। বাঃ সুন্দর বাগানটি।

আমি বোধ হয় একটু খুসী হইয়া উঠিয়াছিলাম বাগান হইতে নিজেই একটা গোলাপ তুলিয়া তাহাকে উপহার দিয়া বলিলাম—এটা নিলে খুব খুসী হব আমি। সে বারবার ধন্যবাদ দিয়া বলিল—মাস্টার মুকুর্জী তুমি খুব ভাল ছেলে। এক কাপ চা খাওয়াবে আমায়?

লজ্জিত হইয়া বলিলাম—নিশ্চয় নিশ্চয়! পূর্বেই আমার বলা উচিত ছিল—মিস্টার চ্যাটারসন!

চ্যাটারসন বলিল—আর চারটি তোমার মুড়ি। একটু তেল মেখে, বুঝলে? আমি খুব ভালবাসি মাস্টার মুকুর্জী!

তাড়াতাড়ি চাকরটাকে ডাকিয়া বেশ উপাদেয় করিয়া আদা-কড়াই ভাজা ইত্যাদি উপকরণসহ মুড়ি ও চা আনিতে বলিয়া দিলাম—বলিলাম—দেরী করবি না, শিগগির আনবি।

—চ্যাটারসন চারিদিকে বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল, সে এইবার বলিল,—মাস্টার মুকুর্জী; কিছু মনে ক'রো না, তোমার অবস্থা খুব ভাল, নয়?

একটু ক্ষুণ্ণ হইলাম—অপরিচিতের এমন করিয়া কি অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করা ভদ্রতাসম্মত? তবুও উত্তর দিলাম—ভাল কাকে বল তুমি? তোরাদের জীবনের ধারা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে গেলে এ কতটুকু?

সে উত্তর দিল—তুমি কি জান মাস্টার মুকুর্জি, আমি মাত্র ত্রিশ টাকা মাইনে পাই, কলকাতায় আমার স্ত্রী আছে একটি মেয়ে আছে। তার তুলনায় তুমি কি ধনী নও? অবশ্য আমি তোমায় হিংসা করছি না।

একটু বেদনা অনুভব করলাম। কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

চ্যাটারসন তারপর একে একে আমার সংসারে কে আছে কি আছে খুঁটিনাটিটি পর্যন্ত সংবাদ লইল। সংসারে পুরুষের মধ্যে আমি একা, বাল্যবয়সেই পিতৃহীন শুনিয়া সে হায় হায় করিয়া উঠিল। আশ্চর্য লোক, চোখও যেন ছল ছল করিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, তুমি কি বিবাহিত মাস্টার মুকুর্জী? বলিয়াই সে মার্জনা ভিক্ষা করিয়া বলিল, কিছু মনে করো না। তোমাদের অল্প বয়সে বিবাহের প্রথা আছে কিনা—তাই জিজ্ঞাসা করছি

হাসিয়া বলিলাম—না না, কিছু মনে করিনি আমি। বিবাহিত আমি নই।

সে চট্ করিয়া বলিল, বিবাহে যেন তুমি টাকা দাবী ক'র না মুকুর্জী। ওটা তোমাদের সমাজের অত্যন্ত হীন প্রথা।

আমি এবার ক্ষুণ্ন না হইয়া পারিলাম না একজন বিদেশী বিজাতীয় ব্যক্তি আমাদের সমাজকে আক্রমণ করিবে—এটা আমার সহ্য হইল না; বলিলাম—কিন্তু তোমাদের সমাজেও কি যৌতুক প্রথা নাই?

সে অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—না, না, আমি সেভাবে কথাটা বলি নাই মুকুর্জী। তুমি মাপ করো আমাকে। তারপর হঠাৎ বলিল—সেদিন তোমাকে একটা কঠিন কথা বলেছিলাম মুকুর্জী। দেখ বাঙ্গালী হিন্দু বাড়ীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিল বাঙ্গালী হিন্দু। আমি অনেক কথা জানি তোমাদের সম্বন্ধে। দুর্গাপূজা কালীপূজা অনেক জানি। তোমাদের লক্ষ্মীপূজা আমার ভারী ভাল লাগে। ওঃ কি বলে—সুইটস্ তৈরীকরো তোমরা পিঠা-পিঠা ;পিঠা চমৎকার জিনিস

কষ্ট।—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমি তাদের সঙ্গে সব সংশ্রব ছেড়ে দিয়েছি। কেন জান? আমার বন্ধুর বড় একটি মেয়ে—সুন্দর মেয়ে—তার বিয়ে হল না। শেষ পর্যন্ত—চ্যাটারসন থামিয়া গেল।

চাকরটা এই সময়ে মুড়ি ও চা লইয়া আসিল। চ্যাটারসন মুড়ির থালা হাতে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল তারপর অন্যমনস্কভাবে মুড়ি ও চা খাইয়া বলিল—মুকুর্জী আজ তোমার কল্যাণে আমার সকালের খাবারের পয়সাটা বেঁচে গেল।

এ কথার কি জবাব দিব, নীরব হইয়া রহিলাম।

চ্যাটারসন বলিল—দেখ মুকুর্জী—এই যৌতুক প্রথার জন্য তোমাদের কত মেয়ে পুড়ে মরেছে। সেইজন্য কথাটা বলছিলাম। টেরিবল্‌-মুকুর্জী, টেরিবল্‌! কখনও যেন তুমি যৌতুকের দাবী করো না বিয়েতে।

আমি বলিলাম—তোমার কথা মনে রাখিব মিঃ চ্যাটারসন।

সে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল—ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

বিদায় লইয়াও চ্যাটারসন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বলিল, তোমার অবস্থা তো ভাল মাস্টার মুকুর্জী কিন্তু সেদিন চার আনা পয়সা দিতে তুমি এমন রূঢ় হয়ে উঠলে কেন?

আমি ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সে বলিল—জান—ত্রিশটা টাকার মধ্যে এক পয়সাও আমি নিজের জন্য খরচ না করতেপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেটা আমার স্ত্রীকন্যার জন্যে। কুলিদের কাছে যা পাই তাতেই আমার খোরাক চলে! কিন্তু মদের পয়সাটা ওটা ছাড়তে পারিনা মুকুর্জী। তাই ভিক্ষেও করি। ভিক্ষুক বলে আজ কি চার আনা পয়সা তুমি দিতে পার না? আজ কদিন থেকে গিলবার্ট বড্ড কড়া

নজর রাখছে। কুলীদের কাছে পয়সা আদায় করা কঠিন হয়ে পড়েছে। খোরাকীর পয়সা থেকে মদ খাই। খাওয়া হয় না।

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া লজ্জায় পড়িয়া চার আনা পয়সা সেদিন দিলাম।

লোকটার উপর ঘৃণা হইয়া গেল। লোকটা আরও কয়েকদিনই আসিয়া মদের জন্য ভিক্ষা লইয়া গেছে।

একদিন বলিয়াছিলাম মাস্টার চ্যাটারসন তোনার মদ ছেড়ে দেওয়া উচিত। সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া একান্ত অপরাধীর মত বলিয়াছিল—মুকুর্জী সে আমি পারি না। তুমি জাননা মুকুর্জী—আমার কি কষ্ট! আজ এক বৎসর—থাক্ মুকুর্জী—সে তুমি শুনতে চেয়ো না।

শুধু আমার কাছেই নয় অনেকের কাছেই সে এমনভাবে ভিক্ষা চায়। বৎসর দুয়েক পরই ইহার ফলও একদিন ফলিয়া গেল। তখন লাইন খুলিয়াছে। নিয়মিত ট্রেন চলিতেছে। চ্যাটারসন গার্ডের কাজই করিতেছিল। তাহার এই মদেরজন্য পয়সা চাওয়ার অত্যাচারে জনকয়েক ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া রেলওয়ের অফিসার ইন্‌চার্জের নিকট দরখাস্ত করিয়া বসিল। ব্যাপারটা আমি জানতাম না। চ্যাটারসনই আসিয়া আমার কাছে কাঁদিয়া পড়িল। সেই সব জানাইয়া বলিল—মুকুর্জী তুমি আমাকে রক্ষা কর।

আমার করুণাও হইতেছিল আবার ভাবিতেছিলাম এমন ঘৃণ্য লোককে কেন সাহায্য করিব?

চ্যাটারসন করণা ভিক্ষা করিয়া বলিল—মাস্টার মুকুর্জী!

কঠিন হইবার চেষ্টা করিয়া আমি বলিলাম—আমি এর কি করতে পারি—মিস্টার চ্যাটারসন?

পার, তুমি পার মুকুর্জী। যারা দরখাস্ত করেছে—তাদের দরখাস্তখানা প্রত্যাহার করতে রাজী করে দাও তবে আমি বেঁচে যাই। আমি তাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতেও রাজী আছি। জান, মুকুর্জী, আমি জীবনে একটা সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়েছি। আজ চার বৎসর স্ত্রী-কন্যার মুখ দেখি নাই। আমার সে সঙ্কল্প পূর্ণ হতে আর বেশী বিলম্ব নাই! বড় জোর ছ-মাস তার আগে চাকরী গেলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে!

লোকটার কাতর মিনতিতে তাহাকে সাহায্যে না করিয়া পারিলাম না। চ্যাটারসন সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। আমাকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়াও তাহার তৃপ্তি হইল না—কেমন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে খুঁজিয়া সে যেন পাগল হইয়া উঠিল। আমি সেদিক হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য—প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিলাম। আমার বিবাহের সংবাদটা তাহাকে দিয়া বলিলাম, আমি যে বিয়ে করছি মিস্টার চ্যাটারসন। তুমি বর যাত্রী যাবে?

সে খুশী হইয়া উঠিল—বলিল' সত্যি বলছ মিস্টার মুকুর্জী?

—সত্যি। আর জান আমি তোমার কথাই রেখেছি, বিনা পণেই বিবাহ করছি।

চ্যাটারসন অভিভূতের মত চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ খাঁট্রি বাংলায় বলিল--দীর্ঘজীবী হও মিস্টার মুকুর্জী। দাম্পত্য জীবনে তুমি সুখী হও।

তার চোখের কোণে জল দেখা গিয়াছিল; রুমাল দিয়া চোখ মুছিয়া সে হাসিয়া বাংলাতেই বলিল—ভাবী বধূ নিশ্চয় খুব সুন্দরী।

পুলকিত অন্তরেই জবাব দিলাম—সত্যই যাকে সুন্দরী বলে। কিন্তু তুমি বাংলা জান দেখছি।

মিঃ চ্যাটারসন লজ্জিতভাবেই স্বীকার করিল—জানি। বলেছি তো—তোমাদের বাঙালী ঘরের সঙ্গে আমার ছেলেবেলা থেকে মেলামেশা ছিল। আমার বন্ধুর কথা তো বলছি। লালপেড়ে শাড়ী পরে কুমারী সুন্দরী মেয়েরা ট্রেনে যায় মুকুর্জী—আমার মনে পড়ে যায় আমার বন্ধুর মেয়েকে। ওঃ—তেমনিসুন্দরী—তেমনি লক্ষ্মী বউ যেন তোমার হয়।

সত্যই ভাবীবধূ আমার সুন্দরী। আমার মাসীমা সম্বন্ধ করিয়াছেন, বধূর জননী মাসীমার প্রতিবেশিনী। নিতান্ত দুঃস্থ অবস্থার ঘর—মা নিজে ভাত রাঁধিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। মেয়েটির বাপ থাকিয়াও না থাকা তিনি সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেছেন।

মেয়ে দেখিয়া মাও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌দান করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া বিবাহের উদ্যোগে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন।

বিবাহ যেদিন করিতে গেলাম সেদিস চ্যাটারসন বলিল, মুকুর্জী ফেরবার সময় কিন্তু আমার জন্যে একটা বিলাতী মদের পাঁইট এনো।

আমার পরিতৃপ্ত পুলকিত মন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। বলিলাম, নিশ্চয়। আর আমাদের বউভাতে তোমার নেমতন্ন রইল।

সে বলিল—নিশ্চয়—নিশ্চয়। কি বলে—তোমাদের সেই চচ্চাড় খেতে আমি খুব ভালবাসি। আর একটা মাছের মাথা খাওয়াতে হবে!

হাসিয়া বলিলাম—নিশ্চয় খাওয়াব।

সেদিনও তাহাকে একটা টাকা দিলাম। সে ম্লান হাসি হাসিয়া এবার বাংলাতেই বলিল—আমি অত্যন্ত হতভাগ্য মুকুর্জী। তুমি আমার কথা রাখলে, বিনা পণেই বিবাহ করছ তুমি, আর আমি—তোমার কথা রাখতে পারলাম না। মদ ছাড়তে পারলাম না।

বধূর নাম উমা।

বিবাহ শেষে আমার শ্বাশুড়ী কাঁদিয়া বলিলেন—বাবা, তুমি আমার দেবতার চেয়েও বড়! তোমার মা আমার কাছে সাক্ষাৎ ভগবতী। জান বাবা বড় মেয়েআমার এই বিয়ে না হাওয়ার জন্যে আত্মহত্যা করেছে কেউ জানে না সে কথা! তোমার মাসীমাও জানেন না। কিন্তু তোমার কাছে গোপন করব না। সে আমার অনেক দুঃখ।

বিদায় লইয়া উমা কাঁদিতে লাগিল, সে কান্না তাহার আর থামে না!

হাওড়া স্টেশনে আসিয়া চ্যাটারসনের কথা মনে পড়িল, কেলনার হইতে একটা পাঁইট হুইস্কি কিনিয়া লইলাম।

ব্রাঞ্চ লাইনের জংস্‌নে নামিয়া চ্যাটারসনের খোঁজ করিলাম। সে তখনও আসে নাই। বরযাত্রীরা ছড়াইয়া কয়েকখানা গাড়ীতে উঠিল উমাকে লইয়া আমি একখানা সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলাম।

টিকিট করিয়া গাড়ীতে উঠিতেছিলাম—এমন সময় শুনিলাম—হ্যালো মিস্টার মুকুর্জী! চ্যাটারসনের কণ্ঠস্বর।

ফিরিয়া বলিলাম—এস এস তোমার জিনিস এনেছি।

সে পরম আনন্দভরে বসিল, লং লিভ মাই মুকুর্জী এ্যাণ্ড মিসেস্ মুকুর্জী। কিন্তু বউ দেখাবে না তোমার?

ডাকিলাম—এস।

গাড়ীর দরজা খুলিয়া তাহাকে ডাকিলাম। ব্যাগ হইতে বোতলটা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিতে গিয়া অবাক হয়ে গেলাম।

চ্যাটারসনের চোখে সে এক অদ্ভুত দৃষ্টি, উমার চোখেও ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহারই প্রতিবিম্ব, দুজনেই থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

অকস্মাৎ উমা বলিয়া উঠিল—বাবা।

চ্যাটারসন হু-হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—মা—উমা! উমি আমার উমারাণী!

জন আর্ডেন চ্যাটারসন নয়—জনার্দন চট্টোপাধ্যায়—উমারই নিরুদ্দিষ্ট পিতা।

সেই গাড়ীতে বসিয়াই তিনি বলিলেন—বাবা অরুণ, যে দিন বড় মেয়ে রমা বিয়ে না হওয়ার লজ্জায় আত্মহত্যা করলে—সেদিন পাগল হয়ে গিয়ে ছিলাম। তারপর—চাকরীর খোঁজে—কত ঘুরলাম—কিছু হ'ল না। শেষে এক পাদরী বললে—তুমি যদি কৃশ্চান হও তবে তোমাকে চাকরী করে দিতে পারি। ভাবলাম—কি হবে আমার জাতে? কৃশ্চান হলাম। এই গার্ডগিরি চাকরী নিলাম। প্রতি মাসের মাইনেটি আমি জমা করে যাচ্ছি আমার উমার বিয়ের জন্যে। সংকল্প ছিল হাজার টাকা হ'লেই টাকাটা উমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে বাস করে দেব এবারের পালায়। মদ না খেয়ে থাকতে পারতাম না। তাই ভিক্ষে করেছি তবুও এ টাকা থেকে এক পয়সা ভাঙিনি। আমি ফিরিঙ্গী নই এ কথা একদিনও কাউকে জানতে দিইনি! মাতৃভাষায় আজ তিন বৎসর কথা কইনি। উঃ!

উমা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। উমার বাবা বলিলেন উমাকে একবার বুকে নেব অরুণ?

আমিও কাঁদিয়া বলিলাম—আমায় জিজ্ঞেস করছেন সে কথা!

ট্রেনটা আমাদের স্টেশনের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। বলিলাম—আসবেন তো বউভাতের দিন!

তিনি শিহরিয়া উঠিলেন—না—না—না। ও কথা বলো না। এতটুকু লজ্জাবোধ মর্যাদাবোধ আমার আজও আছে।

ট্রেন থামতেই তিনি উমাকে বলিলেন—কাঁদিসনে উমি। তোর ভাগ্য মা উমারাণীর মতই। খবরদার একথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করবি না। আমার অরুণের মাথা হেঁট না হয়!

যাইবার সময় বোতলটাকে তুলিয়া জানালা দিয়া ফেলিয়া দিলেন।

পরদিনই সংবাদ পাইলাম—গার্ড চ্যাটারসন নিরুদ্দেশ।

কয়দিন পর আমার কাছে একখানা ইনসিওর আসিল—নয়শত যাট টাকার। উমার বিবাহের যৌতুক।

সাবিত্রী চুড়ি

ঠিক হইল গ্রামের ও নিকটবর্তী গ্রামগুলির প্রত্যেক ভদ্রলোককে মাসে চারিখানা করিয়া রিপ্লাই-কার্ড লিখতেই হইবে। অপরাপর চাষী কামার ছুতার গৃহস্থকে লিখিতে হইবে তুইখানি রিপ্লাই কার্ড; নিতান্ত হীন অবস্থার লেকেজনকে বাদই দেওয়া হইল। রিপ্লাই পোষ্ট-কার্ড ছাড়া অন্য প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লেখা যথানিয়মে তো চলিবেই।

ব্যাপারটা হইল হারানন্দপুর গ্রামে পোস্টাফিস স্থাপনের উদ্যোগপর্ব। অনেকখানি স্থান লইয়া এই অঞ্চলটায় পোস্টাফিসের বড় অসুবিধা; প্রায় তিন ক্রোশ দূরবর্তী শহরে পোস্টাফিস স্থাপিত; সপ্তাহে তুইটি দিন বিট—ছোট ছোট গ্রামগুলোয় তাও নাই, সেখান সপ্তাহে ছয়দিন অপেক্ষার পর সাতদিনের দিন পত্র আসে। এ ছাড়াও একটু গ্রাম—সেই মান-সম্মানের ব্যাপারও আছে। পশ্চিমে তিন ক্রোশ দূরবর্তী নবাবপুর ছোট একখানা এতটুকু গ্রাম—সেই গ্রামের অমর বাঁড়ুজ্জে অকস্মাৎ আঙুল ফুলিয়া কলা-গাছ হইয়া গ্রামে একটা পোস্টাফিস বসাইয়া ফেলিয়াছে। অথচ হারানন্দপুর বড় গ্রাম—গ্রামের বর্ধিষ্ণু শিক্ষিত কায়স্থ সমাজের বাস—সে গ্রামে পোস্টাফিস নাই! কেহই টিটকারী না দিলেও সকলের মাথা আপনিই হেঁট হইয়া গেল। সকলে মিটিং করিয়া উপরোক্ত প্রস্তাব আইন

স্বরূপে গ্রহণ করিয়া ডাক-বিভাগের পোস্টাফিসের জন্য একটি দরখাস্ত করিয়া বসিস।

ডাক-বিভাগও যথাসময়ে যথানিয়মে উত্তর দিল—'পরীক্ষা-গ্রহণীয়' হিসাবে অর্থাৎ 'এক্সপেরিমেণ্টাল' পোস্টাফিস মঞ্জুর করা হইল। ছয়মাস পর পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়া ফল সন্তোষজনক হইলে যথারীতি ব্রাঞ্চ পোস্টাফিস দেওয়া হইবে। ছয়মাস এখন কত চিঠি যায় এবং কত চিঠি আসে তাহার হিসাব রাখা হইবে। তাই চিঠির সংখ্যা সন্তোষজনকের উপরে তুলিবার জন্য এই রিপ্লাই কার্ড লিখিবার আইন জারী হইল। সিংহ বাবুরা একখানা ঘর ছাড়িয়া দিলেন, উচ্চ প্রাইমারী পাঠশালার ম্যাট্রি-কুলেশান পাশ করা পণ্ডিতও বিনা বেতনে কয়েক মাস পোস্টমাস্টারী করিতে রাজী হইল ; কিন্তু পিওন লইয়াই সমস্যা হইল, সমুদ্র পার হইয়াও গোষ্পদ পার হওয়াই হইল সমস্যা। পিওন কোথা পাওয়া যায়। বিনা বেতনে কে এ কাজ করিবে ? লেখাপড়া জানা লোক চাই ; কাজটিও নেহাৎ হাওয়া-খাওয়া কাজ নয়, রীতিমত দুপুরের রৌদ্র মাথায় করিয়া দৈনিক কয়েক মাইল ঘুরিয়া আসিতে হইবে।

সিংহবাবু বলিলেন গাঁয়ে বেকার ছেলের ত অভাব নাই, কিন্তু তারা কি একাজ করবে ? বিষ না থাকলে হবে কি, কুলো-পানা চক্র যে আছে সব। প্রবীণ মিত্র মহাশয় এককালে সরকারী চাকুরে ছিলেন, এখন পেন্সন পান। তিনি আধুনিক মনোভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি ; তিনি হরি চাটুজ্জেকে বললেন—চাটুজ্জের ছেলে এনট্রেন্স ফেল করে বসে রয়েছে ! লাগিয়ে দাও না চাটুজ্জ, মাইনে ছ'মাস পরে হবে তো।

চাটুজ্জে অতন্ত্য ক্ষুব্ধ হইয়া গেল, এ কথার কোন উত্তর না দিয়া

বলিল—আপনার মেজনাতি তো থার্ড কেলাস থেকে পড়া ছেড়ে এসে ঘরে বসে তাস পিটছে, তাকেই লাগিয়ে দিন না। হবে তো মাইনে। সরকারী চাকুরীও বটে, পেন্সনও আছে!

সমস্ত মজলিসটা অন্যরূপ ধারণ করিল; আলোচনা—আলাপ সমস্ত স্তব্ধ হইয়া গেল—আসন্ন ঝড়ের পূর্বলক্ষণ ঘনায়িত হইয়া উঠিল। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা ঝড় উঠিল না। মিত্র মহাশয় কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অপরদিক দিয়া চাটুজ্জেও প্রস্থান করিল। তারপর একে একে সকলেই। সর্বশেষে সিংহবাবু বলিলেন—তাহলে সভাপতিকে ধন্যবাদটা—কিন্তু ধন্যবাদ দিবার কেহ ছিল না। গ্রামের সর্বাপেক্ষা প্রধান ভট্টাচার্য মহাশয় ছিলেন সভাপতি। তিনি বলিলেন—থাক, থাক। ও আর এমন কি!

এমন সমস্যার কিন্তু দুইদিন পর অকস্মাৎ অত্যন্ত সহজে সমাধান হইয়া গেল। গোবিন্দ বৈরাগী আসিয়া সিংহবাবুকে প্রণাম করিয়া বলিল—আজ্ঞে বাবু, আমাকে চাকরীটা দেন কেনে।

—চাকরী? বিস্মিত হইয়া সিংহবাবু বলিলেন—চাকরী? চাকরী তো এখন কিছু নাই বাপু! চাকর বাকর তো আর আমার দরকার নাই।

—আজ্ঞে না, চাকরের কাজ নয়, ওই ডাকঘরের পিওনী।

—পিওনের কাজ? সিংহবাবু হাসিলেন। গোবিন্দ বৈরাগী ভিক্ষা

করিয়া খায়, নিরক্ষর বৈষ্ণবের ছেলে, লোকটার মাথায় একটু ছিটও আছে। বাবু হাসিয়া বলিলেন—কিন্তু মাইনে যে নেই গোবিন্দ।

গোবিন্দ হাত জোড় করিয়া উত্তর দিল—আজ্ঞে হবে তো।

বাবু কহিলেন—সে তো পরে। এখন খাবে কি? ভিক্ষা করবে, না পিওনী করবে।

—আজ্ঞে দুইই করব। ভিক্ষা করতে তো গাঁয়ে ফিরতেই হয়। তা এক কাঁধে থাকবে ভিক্ষার ঝুলি, এক কাঁধে থাকবে চিঠির ঝুলি।

—এটা ভাল বলেছ গোবিন্দ! কিন্তু লেখাপড়া জানা লোক চাই যে! চিঠির ঠিকানা পড়তে হবে তো! রামের চিঠি শ্যামকে দিলে তো চলবে না।

—আজ্ঞে লেখাপড়া আমি কিছু কিছু জানি হুজুর!

—জান? বাবু এবার প্রত্যাশায় গম্ভীর হইয়া আন্তরিকতার সহিতই প্রশ্নটা করিলেন এবং একটু সজাগ হইয়া বসিলেন।

আজ্ঞে হাঁ—উচ্চ প্রাইমারী পর্যন্ত পড়েছি আমি পাঠশালায়। বাবা চাকরী করতেন কির্ণাহারে—সেখানে আমি পড়েছি বাবুদের পাঠশালায়।

বিস্মিত হইয়া বাবু বলিলেন—হুঁ। আচ্ছা—পড়তো দেখি এই কাগজটা।

গোবিন্দ অবলীলাক্রমে পড়িয়া গেল—আনন্দ-বাজার পত্রিকা, বৃহস্পতিবার উনিশ শো সাঁইত্রিশ।

বাধা দিয়া বাবু বলিলেন—ছাপা লেখা তো হবে না। হাতের লেখা, আচ্ছা পড়—এই ঠিকানাটা পড়।

গোবিন্দ পড়িল—মহামহিম মহিমার্নব—শ্রীযুক্ত শঙ্করপ্রসাদ সিংহ—জমিদার বাবু মহাশয় বরাবরেষু।

—বাঃ—বাঃ। তাই তো গোবিন্দ তুমি যে এমন লোক—তা তো জানতাম না হে! এঁ্যা—এযে গড় গড় করে পড়ে গেলে। বেশ হবে, ঠিক হবে।

গোবিন্দ প্রশংসায় পরিতৃপ্ত হইয়া সলজ্জভাবে হাসিয়া নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। বাবু আবার একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলে, কথাটা হঠাৎ তাঁহার মনে পড়ে গেছে। তিনি বললেন—কিন্তু সব চিঠিই তো বাংলাতে ঠিকানা লেখা থাকবে না। ইংরাজী ঠিকানার চিঠি পড়বে কেমন করে?

গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—আজ্ঞে—পোস্টমাস্টার বাবু বলে দেবেন, আমি পেনসিল দিয়ে বাংলাতে লিখে নেব ঠিকানা খামের ওপর।

বাবু মহাখুসী হয়ে বললেন—তুমি ঠিক পারবে গোবিন্দ! ঠিক পারবে! বেশ, তাই কাজ আরম্ভ করে দাও তুমি—ভালই হবে তোমার। ভবিষ্যতে তো ভালই হবে—পিওনীর আরম্ভই হ'ল ষোলটাকা মাইনেতে, কি আরও বেশী বোধ হয় আজকাল।

গোবিন্দ বলিল—ইংরেজী-ও তা কাজ করতে করতে শিখে নোব আমি।

গোবিন্দ হাসিতে হাসিতে আসিয়া উঠিল লক্ষ্মী বৈষ্ণবীর বাড়ী—। লক্ষ্মী প্রশ্ন করিল হাসছ যে?

—হাসছি।

ওই কথা শুনলে আমার সমস্ত গা জ্বলে যায়। হাসছ যে? না হাসছি। তা সে হাসি আমাকে দেখান কেন? ওই মাঠে গিয়ে হাস গে।

গোবিন্দ পুলকিত হইয়া উঠিল। সে এবার বলিল—এবার আর তোমার 'না' শুনছি না। আমার চাকরী হ'ল।

—চাকরী ? লাটসাহেবী নাকি ? লাটসাহেব বেলাতে যাবে, তাই তোমাকে চাকরীটা দিয়ে যাবে নাকি ?

—লাটসাহেবী নয়—তবে পিওনী বটে। এর পরে পোষাকও দেবে। পেনটুন, কোট, পাগড়ী, পায়ে পটি না কি বলে তাই। মাইনে হবে কুড়ি টাকা মাসে। বছরে বছরে বাড়বে।

—মাইনে হবে। হয় নাই এখনও। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। তা বেশ, মাইনে হোক —তারপর হবে।

অর্থাৎ বিবাহ। লক্ষ্মী গোবিন্দের বাল্যসখী নয়; তবে বাল্য-কালে তাহাদের বিবাহের একরূপ স্থির হইয়াছিল অকস্মাৎ একদা সে সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায়। লক্ষ্মীর এক মামা ছিল শহুরে বৈরাগী। সে কাজ করত রেলের এক জংসনে। সে একদিন আসিয়া লক্ষ্মীকে দেখিয়া প্রস্তাব করিল, একটি ভাল পাত্তর আছে। সে ভাল মেয়ে চায়। দেবে বিয়ে ? ছেলেটি চাকরী করে রেলে, গাড়ীর নম্বর লেখে। পঁচিশ টাকা মাইনে। তা ছাড়া তোমার জিনিসপত্র কিনতেই হয় না ; রেলের মাল তো। সে এক বিচিত্র হাসি হাসিল।

লক্ষ্মীর মা সে প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না। চাকুরে বরেই বিবাহ দিয়া সে কন্যার সঙ্গে জামাতার বাড়ী বাস করিতে চলিয়া গেল। গোবিন্দ তখন পিতার মৃত্যুর পর পিতার চাকরীতে বাহাল হইয়াছে। কির্ণাহারের বাবুর খাস খানসামা। সংবাদটি শুনিয়া গোবিন্দ চাকরীটাই ছাড়িয়া দিল। বৈরাগীর ছেলে—কাঁধে ঝুলি লইয়া জাতি ব্যবসা আরম্ভ করিল। সেই ব্যবসা তাহার আজও চলিতেছে।

সাবিত্রী চুড়ি

দশ বারো বৎসর পর লক্ষ্মী একদিন বিধবা হইয়া দেশে ফিরিল। লক্ষ্মীর মাও তখন মারা গিয়াছে। গোবিন্দ লক্ষ্মীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সেই লক্ষ্মী-এই। রূপ-যৌবনে সমৃদ্ধা লক্ষ্মীর পরণে ধপধপে মিহি পাড় ধুতি, হাতে একগাছি করিয়া বোধ হয় সোণারই চুড়ি। মাথার চুল বেণী করিয়া না বাঁধিলেও পরিপাটি ছাঁদে বিন্যস্ত। গোবিন্দ লক্ষ্মীর পায়ে আপনাকে বিকাইয়া দিতে চাহিল। কিন্তু লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল— গোবিন্দকে কিনিবার মত কানাকড়ি তাহার ভাণ্ডারে নাই। সে বলিল —ভিখারীর আবার বিয়ের সাধ কেন?

গোবিন্দ সবিনয়ে বলল—আমি চাকরী করব লক্ষ্মী। আমি গেলেই বাবুরা আমাকে কাজ দেবে।

—কি খানসামাগিরি। লক্ষ্মীর চোখ দুইটা কৃত্রিম বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।—ওরে বাপরে এতবড় চাকুরের পরিবার আমি হতে পারব না! বলিয়া সে যে হাসি হাসিল, সে হাসি অত্যন্ত নির্মমভাবেই গোবিন্দকে আঘাত করিল। গোবিন্দ আর দুইমাস লক্ষ্মীর বাড়ী হাঁটিল না। দুই মাস পর আবার সে একদিন আসিয়া বলিল, আচ্ছা লক্ষ্মী, আমি যদি চাষবাস করি?

লক্ষ্মী প্রশ্ন করিল—টাকা?

—টাকা আমার কিছু আছে।

—কত সেইটা শুনি না কেন?

—শো আড়াইয়েক টাকা আছে।

—আড়াই শো। জমি হবে আড়াই বিঘে। তার ধানে আমি খাব তুষ, আর তুমি ভাত নাকি? না, আমি খাব ভাত, তুমি তুষ খাবে? বলিয়াই আবার সেই হাসি। তারপর সে স্পষ্টই বলিয়া দিল—দেখ এ

জন্মে আর হয় না। কি করব বল আমার চালচলন তো দেখছ। আমি বাপু ভাল না হলে খেতে পারি না—ভাল না হলে পারতেও পারি না। আজ গোবিন্দ তাই হাসতে হাসতে আসিয়া লক্ষ্মীর প্রশ্নের উত্তরে বলিল হাসছি।

কিন্তু সংবাদটা পাইয়াও লক্ষ্মী তাহাকে সাগ্রহে সম্মতি দিল না। বলিল তা' বেশ মাইন হোক। হবে তারপর।

গোবিন্দ তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইল না। এত দীর্ঘ দিন সে অপেক্ষা করিয়াছে, আর তো ছয় মাস। বেশ তাই, তারপরই হবে। সে শুধু বলিল—কিন্তু সেদিন তো আর না বলবে না?

এবার লক্ষ্মী আর পরিহাস করিল না, বলিল—না।

হরিপদ হাজরা, ঘোষপুর। কাঁচা ইংরাজী হাতের লেখা—হাজরার ছেলের চিঠি। ছেলেটি আমেদপুর স্কুলে পড়ে, বোর্ডিং এ থাকে। ঠিক তাই। এই যে লিখিয়াছে শ্রীচরণ কমলেষু। টাকা পাঠাইতে লিখিয়াছে।

দ্বিপ্রহর রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া মাঠের একটা পুকুরের ধারে একটা গাছের তলায় বসিয়া গোঁবিন্দ চিঠিগুলি দেখিতেছিল! সমস্ত চাকলার সংবাদটা এখন তাহার নখদর্পণে। সে লুকাইয়া মাঠে বসিয়া এমনি করিয়া পোস্টকার্ডের চিঠিগুলি পড়ে। খামের চিঠিগুলির উপর তাহার দারুণ কৌতুহল—কিন্তু ভয়ে সেগুলি খুলিতে পারে না।

ভবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—রতনডাঙ্গা নিশ্চয় মামলার চিঠি। ডাঃ লোকটার এত মোকর্দমা ও আছে। দেশের সর্বনাশ করিয়া দিল। শ্রীরাম ঘোষের মত অবস্থাপন্ন চাষী ভট্টচার্যের পাঁচশত টাকা ঋণের দায়ে সর্বস্বান্ত হইয়া গেল। এ আবার কার সর্বনাশ আরম্ভ করিয়াছে।

উঃ, উকিলের লেখা বটে। বহু-কষ্টেই গোবিন্দ পড়িল—নন্দলাল গোপের মামলার দিন আগামী ১২ই তারিখ আছে। অবশ্য অবশ্য ৫।৭ টাকা খরচ সহ আসিবেন। পরামর্শমত সমন চাপিয়া দেওয়া হইয়াছে। একতরফা ডিগ্রী হইবেই।

সর্বনাশ! গোবিন্দের ইচ্ছা হইল চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু…! না, সে হয় না। চাকরি চলিয়া যাইবে নন্দকে খবরটা গোপনে দিলে কেমন হয়? গোবিন্দ উপায় পাইয়া খুসি হইয়া উঠিল। নন্দর গ্রামেতে যাইতেই হইবে। দুইখানা চিঠি আছে। রঙীন খামের চিঠি, একটু মিষ্টি গন্ধও পাওয়া যায়। শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী। তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে একটি সলজ্জ অবগুণ্ঠিতা বধূর মূর্তি ভাসিয়া উঠিল। ঠিক আজ যে দরজার আড়ে দাঁড়াইয়া আছে সম্মুখে তাহার পাচ বছরের ছেলেটি। তাহাকে দেখিলেই বলিবে—পিওন আমাদের চিঠি?

চিটি লইয়াই বলিবে, দাঁড়াও ভিক্ষে নিয়ে যাও। অন্ততঃ একমাসের চাল আনিয়া সে ঢালিয়া দেয়। প্রত্যেক বিটে তাহার চিঠি থাকিবেই—কোন কোন বিটে তাহার দুইখানাও থাকে। যুবক স্বামীটি একদিনে পাইবে জানিয়াও উপুর্যপরি চিঠি দিয়া বসে। আজও দুইখানি চিঠি আসিয়াছে। পিওনের পদে পাকা হইলে সেও তো আর এক স্থানে থাকিবে না; এখানে ওখানে বদলী করিবেই। তখন সেও পত্র লিখিবে লক্ষ্মীকে। শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দাসী, কেয়ারফ—গোবিন্দচন্দ্র দাস, ভিলেজ এণ্ড পোস্ট হারানন্দপুর। ইংরাজী তাহার অনেকটা আসিয়াছে, নিজের নাম সে বেশ লিখিতে পারে। আজ এই দুইটা মাস যাইতে যাইতে ঠিকনা পড়িতে ঠিকানা লিখিতে সে বেশ পারিবে। ফার্স্ট বুক এবার শেষ

হইয়াছে—আবারও অর্ধেকের উপর সে পড়িয়া ফেলিয়াছে। সে মনে মনে বানান করতে আরম্ভ করিল 'শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি ডাসী'। কিন্তু লিখবে কি? শুধু আমি ভাল আছি, তুমি কেমন আছ?

আকস্মাৎ তাহার মনটা ওই রঙীন খাম দুইটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য যেন মাথা কুটিতে আরম্ভ করিল। চিঠি দুইখালা বাহির করিয়া একদৃষ্টে চিঠি দুইখানার দিকে সে চাহিয়া রহিল। চট করিয়া তাহার মনে হইল—প্রথম চিঠিখানা এই ছয় তারিখের ছাপ মারা চিঠিখানা না দিলেও তো চলে! এই তো আট তারিখের চিঠিতেই তো সব খবর আছে! সে আর থাকিতে পারিল না, চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল! স্তব্ধ বিবর্ণ রুক্ষ দ্বিপ্রহরটা যেন তাহার চোখের সম্মুখে বর্ণে বৈচিত্র রূপে রসে অপরূপ হইয়া উঠিল। 'প্রাণের সাবিত্রী'।

গোবিন্দ চোখ বুজিয়া লেখক ও পাঠিকার অপূর্ব ভালবাসার রসধারা চুরি করিয়া পান করিয়া আবেগে বিভোর হইয়া গেছে।

কিছুক্ষণ পর সে উজ্জ্বল। গ্রাম গ্রংমান্তরে ফিরিয়া নন্দকে সংবাদ দিয়া ওই সাবিত্রদেবীর বাড়ীর দিকে পথ ধরিল। কিন্তু ভয়ে অনুশোচনায় তাহার পা যেন চলে না।

—পিওন আমাদের চিঠি?

গোবিন্দ বিবর্ণ মুখে একখানি চিঠি তাহার হাতে দিল। চিঠি দিয়াই চলিয়া যাইতেছিল। ছেলেটি বলিল—দাঁড়াও চাল নিয়ে যাও।

বাধ্য হইয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হইল। ওই মেয়েটি চিঠি পড়িতেছে। সে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল।

ছেলেটি চাল আনিয়া ঢালিয়া দিল। গোবিন্দ দ্রুতপদে ফিরিল।

—পিওন! ও পিওন!

গোবিন্দের কণ্ঠ শুকাইয়া গেল, সে উত্তর দিতে পারিল না, কেবল ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

—শোন শোন! মা ডাকছে আমার।

গোবিন্দ শুনিল চাপাগলায় মা তিরস্কার করিল—ছেলের আক্কেল দেখ ওই কথা বলতে আছে? বল—যা বলতে বললাম তাই বল।

ছেলেটি বলল—জলখাবার নিয়ে যাও! আমার বাবার মাইনে বেড়েছে কিনা। একদিন ভাত খাবার নিমন্ত্রণ রইল তোমার।

গোবিন্দ পরম আশ্বাসের একটা নিশ্বাস ফেলিল, বোকা মেয়েটা ধরিতে পারে নাই।

ছয়মাস পূর্ণ হইতে আর পনের দিন বাকী আছে। পাকা পিওনীর পদের জন্য দরখাস্তও হইয়াগেল—দুইশত টাকা জামীনও সে আমানত করিয়া দিয়াছে। আর লক্ষ্মীর 'না' বলিবার পথ নাই। লক্ষ্মী বলিল, চৈত্র মাসে তো আর হয় না। বোশেখের প্রথমেই তা হ'লে দিন ঠিক কর।

গোবিন্দ পাজি দেখিয়া রাখিয়াছে; সে বলিল—ফার্স্ট বৈশাখ ভেরী গুড ডে।

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল—একেবারে রাম পণ্ডিত। বাঙলা করিয়া বল না!

—১লা বৈশাখ—খুব ভাল দিন।

—একেবারে পয়লাই। লক্ষ্মী হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল।

—আচ্ছা—চললাম। চিঠি ক'খানা দিয়ে আসি। গোবিন্দ বাহির হইয়া পড়িল।

সেই বটতলাটি বসা যেন তাহার একটি নিয়ম হইয়া গেছে। বটতলাতে বসিয়া তেমনি চিঠি দেখিতে দেখিতে বাহির করিল সাবিত্রী দেবীর চিঠি। এ চিঠির এখন সে নিয়মিত পাঠক। জল দিয়া ভিজাইয়া খামখানি খুলিয়া সে পড়ে—চিঠির কাগজে কালির অক্ষরে যে রসটুকু থাকে—সেটুকুর প্রলোভন সে কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারে না। পড়িয়া ব্যাগের ভিতরে রক্ষিত সিপি আঁটা একটি আঠার শিশি বাহির করিয়া খামখানি সযত্নে পূর্ব্বের মত আঁটিয়া ফেলিল—চিঠিখানি বিলি করিয়া আসে। আজিকার খামখানি পূর্ব্বাপরগুলির মত নয়। এখানা বেশ ভাল খাম। স্বামীটি বেনারস গিয়াছে—কার্যোপলক্ষে। বেনারসেরই ছাপ। বোধ হয় নূতন স্থানে পূর্বাপর খামগুলির মত খাম মেলে নাই। খামখানার মধ্যে সে সুমিষ্ট গন্ধও নাই—কেমন একটা ঔষধ ঔষধ তীব্র গন্ধ। সে পুকুর ঘাটে নামিয়া খামখানার আঠা মুখটুকু ভিজাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে জলসিক্ত মুখ ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিল। গোবিন্দ সন্তর্পণে একটি দেশলাইয়ের কাঠি দিয়া চিঠিখানা খুলিয়া চিঠিখানা বাহির করিল। সেদিন লোকটি লিখিয়াছিল, "এবার চুড়ি গড়াইয়া লইয়া যাইতেছি; চুড়ির নামও 'সাবিত্রী চুড়ি'; আবার কিছুদিনের মধ্যেই আর একখানা নূতন গহনা দিব। ছোটখাট একটি জিনিস, কি পছন্দ লিখিবে। কাশী যাইতেছি কাজে—সেখান হইতে আনিব লিখিবে। "সাবিত্রীর সাবিত্রী চুড়ি" সে দেখিয়াছে; সেদিন খোকা ছিল না, দরজার আড়াল

হইতে সোনার চুড়ি পরা নিটোল হাতখানা বাহির হইয়া আসিয়াছিল। লক্ষ্মী প্রতিমার মত মেয়ে, সোনার চুড়িতে তাহাকে বড় সুন্দর মানাইয়াছে এবার কি গহণা হইবে? সে যেন এই প্রণয়ীযুগলের বার্ত্তাবহ দূত—পরম অন্তরঙ্গ আপনার জন হইয়া গেল। গোবিন্দ চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিল। এ কি! এ কাহার চিঠি? একি সম্বোধন? 'মহাশয়া।" রুদ্ধশ্বাসে চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে গোবিন্দ অনুভব করিল, কে যেন তাহার গলাটা টিপিয়া ধরিয়াছে—সমস্ত চেতনা যাহার বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। নাই! হরনাথ চক্রবর্ত্তী নাই! "আপনার স্বামী হরনাথ চক্রবর্ত্তী এখানে আসিয়া কলেরায় আক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে আসেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা—চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই। গতকল্য সন্ধ্যায় সময় তিনি মারা গিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে আপনাদিগকে তিনি সংবাদ দিতে বলিয়াছিলেন, সেই সংবাদ অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপনাকে জানাইতেছি।"

ঝর ঝর করিয়া গোবিন্দ কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—থান কাপড় পরা নিরাভরণা বিধবা সাবিত্রী দেবীর মূর্তি! নাই—একেবারে নাই। হারাইয়া গেলে আশা থাকে যে, একদিন আসিবে। এ একেবারে নাই! ওর বাড়ীতে আর চিঠি আসিবে না, প্রত্যাশায় উৎসুক মুখে লাল শাড়ী পরা মেয়েটি চুড়ি পরা হাতে দরজা ধরিয়া আড়ালে আর দাঁড়াইয়া থাকিবে না! গোবিন্দের মনে হইল, তাহার এ পিওনী চাকুরীর আর কোন মূল্য নাই!

হঠাৎ তাহার মনে হইল, চিঠিখানি যদি না দেওয়া হয় তবে তো এ সংবাদ তাহার কাছে অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে। কল্পনাটি মাথার মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে একটা অদ্ভুত রূপে রূপান্তরিত হইয়া উঠিল। কাশী গিয়া

হরনাথ সন্ন্যাসী হয়ে গেছে! তাহা হইলে তো লাল শাড়ী পরা মেয়েটি চিরদিন সোনার চুড়িপরা হাতখানি বাহির করিয়া চিঠির জন্য দাঁড়াইয়া থাকিবে! কিন্তু চিরদিন সে বড় দীর্ঘ! আচ্ছা তিন বৎসর পর সে ফিরিবে! তিন বৎসর পরে আবার পত্র আসবে আরও তিন বৎসর পর!···

উত্তপ্ত মস্তিষ্কে বিচলিত চিত্তে সে ব্যগের ভিতর হইতে দোয়াত কলম কাগজ বাহির করিয়া বসিল। সে লিখিল, 'সংসারে আর আমার ইচ্ছা নাই। কাশীতে একজন সিদ্ধ সন্ন্যাসীকে পাইয়াছি। তিন বৎসর পর—'সহসা তাহার মনের মধ্য হইতে ১লা বৈশাখ কথাটা বাহির হইয়া কলমের ডগায় যেন আপনি আসিয়া পড়িল। সে লিখিল, 'তিন বৎসর পর ১লা বৈশাখ আমি ফিরিব।' এতক্ষণে তাহার মনে হইল, সাবিত্রী যে 'হাতের লেখায়' ধরিয়া ফেলিবে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আবার লিখিল, 'আমার নিজ হাতে তোমাকে পত্র দেওয়া আমার গুরুর নিষেধ আছে, অন্য লোক দিয়া চিঠি লিখাইলাম উত্তেজনার মুখে আকস্মিক আবেগের বশবর্তী হইয়া সে যে কি করিল—তাহা একবার ভাবিয়াও দেখিল না। ডাক্তারের চিঠিখানা ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করিয়া দিয়া আপনার লেখা চিঠিখানা সে খামের মধ্যে পুরিয়া আঠা বন্ধ করিা দিল।

আজও ছেলেটি দরজার মুখে দাঁড়াইয়া ছিল না, শুধু দরজার আড়ালে দেখা যাইতেছিল শাড়ীর লাল প্রান্ত আর দরজার গায়ে আবদ্ধ ছিল প্রত্যাশী একখানি সোনার চুড়ি—সেই সাবিত্রী চুড়ি পরা হাত। চিঠিখানা দিতে গিয়া গোবিন্দের হাত কাঁপিয়া উঠিল; সেখানা তাহার হাত হইতে খসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ব্যস্ত হইয়া সে

চিঠিখানি কুড়াইতে যাওয়ার পূর্বে প্রত্যাশা চঞ্চল মেয়েটিই ঝুঁকিয়া সেখানা যেন ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইল। হাতের চুড়িগুলি যেন ঝঙ্কার দিয়া হাসিয়া উঠিল। বায়ুতাড়িত অবগুণ্ঠনের মধ্যে লজ্জারক্ত একখানি মুখের অধরনীল হস্তেরেখা গোবিন্দের বুকে তীব্র বর্শার মত আঘাত করিল। সে বলিতে গেল—ওগো! কিন্তু তাহার পূর্বে সাবিত্রী লঘু পদক্ষেপে ভিতর চলিয়া গিয়াছে। গোবিন্দ তখনও ভাবিতেছিল, অকস্মাৎ অস্ফুট মৃদু কান্নার আওয়াজ বাড়ির মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেই সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, দ্রুতবেগে সে পলাইয়াই চলিয়া আসিল।

পোস্টাফিসে ফিরিয়া সে যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত বসিয়া পড়িল। মাস্টার জিজ্ঞাসা করিলেন—এমন করে বসলি যে গোবিন্দ ?

গোবিন্দ ঝর ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মাস্টার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আমি কি করব বল্? মিত্তির মশায়, ঘোষ মশায় সবাই যে কালী চাটুজ্জের ছেলেকে রেকমেণ্ড করলে ; তা ছাড়া ছেলেটা ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পড়েছে ওরই হয়ে গেল।

—আজ্ঞে ? একটা অর্থহীন প্রশ্ন করিয়া গোবিন্দ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া মাস্টারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলির, এর মধ্যে তোকে খবরই বা দিলে কে ? আজই তো খবর এসেছে। তোর দরখাস্তের টাকা সব ফিরে এসেছে। তা পিওনের কাজ না হ'ক—রাণারের কাজ করনা তুই।

এতক্ষণে ব্যাপারটা খানিকটা গোবিন্দের মাথায় প্রবেশ করিল, সে বিস্মিত হইয়া বলিল, হল না আমার কাজ ?

মাস্টার নিরুত্তর হইয়া বসিয়া বসিয়া রহিল।

আবার গোবিন্দ প্রশ্ন করিল, কার হল ?

—বললাম যে, কালী চাটুজ্জের ছেলের।

—আমার টাকা ?

—এই নে ! ফেরৎ এসেছে।

গোবিন্দ টাকাগুলি লইয়া সটান ঘরে আসিয়া উঠিল। লক্ষ্মীর কাছে গেল না, সিংহবাবুর কাছে গেল না—আপনার ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া সে কাঁদিতে বসিল।

হায় সে করিয়াছে কি ? মৃত্যু শোক ভীষণ তীব্র তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে শোক চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু এযে দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর প্রত্যাশার উপর হতাশার আঘাত ! একি সহ্য হয় মানুষের ? কাঁদিতে কাঁদিতে সহসা সে উঠিল, ডাকের ঝুলিটা হইতে বাহির করিল একখানা মানি অর্ডার ফর্ম্ম। সেটিতে আপনার কাঁচা হাতের ইংরেজীতে ঘরগুলি পূরণ করিল। হরনাথ চক্রবর্তী পাঠাইতেছে সাবিত্রী দেবীকে আড়াইশত টাকা।

কিন্তু যদি জানিতে পারে—প্রকাশ হইয়া পড়ে ? নির্ব্বাক হইয়া সে ভাবিতে আরম্ভ করিল। স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে সে ফর্ম্মখানার উপরেই আবার কি সব অঙ্কপাত করিল। তিনশো পঁয়ষট্টি গণিত তিন।—চৈত্রমাসের পনের দিন।

পরদিন ডাকঘরে গোবিন্দ আসিল না। মাস্টার ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাণার আসিয়া ডাকিতেই গোবিন্দ প্রশ্ন করিল—একহাজার পঁচানব্বই আর পনের কত হয় বল দেখি ?

—মাষ্টার মশায় ডাকছেন গো! এস। রসকস রাখ এখন।

গোবিন্দ আসিয়া মাষ্টারকেও প্রশ্ন করিল—তিন শো পঁয়ষট্টিকে তিন দিয়ে গুণ করিলে তো আপনার একহাজার পঁচানব্বই? এ্যাঁ?

অবাক হইয়া মাষ্টার বলিলেন—হ্যাঁ, তা কি?

—আর এ মাসের মানে চৈত্র মাসের আর পনর দিন—তা'হলে এগারশ-দশ। ঠিক তো?

মাষ্টার বলিলেন—তুই বলিছিস কি রে বাপু?

গোবিন্দ বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে পোষ্টাফিস হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। কি বলিল—সাবিত্রী চুড়ি—এক হাজার পঁচানব্বই—মাষ্টার অবাক হইয়া গেলেন।

রাণারটা বলিল মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে মশায়। লক্ষ্মীর সঙ্গে তো আর বিয়ে হবে না। লক্ষ্মী বলে দিয়েছে এর মধ্যে। চাকরী হ'ল না।·

মাষ্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি বলিলেন—ডাক, কালী চাটুজ্জের ছেলেকেই ডাক, আজ থেকেই কাজ লাগুক।

শেষ